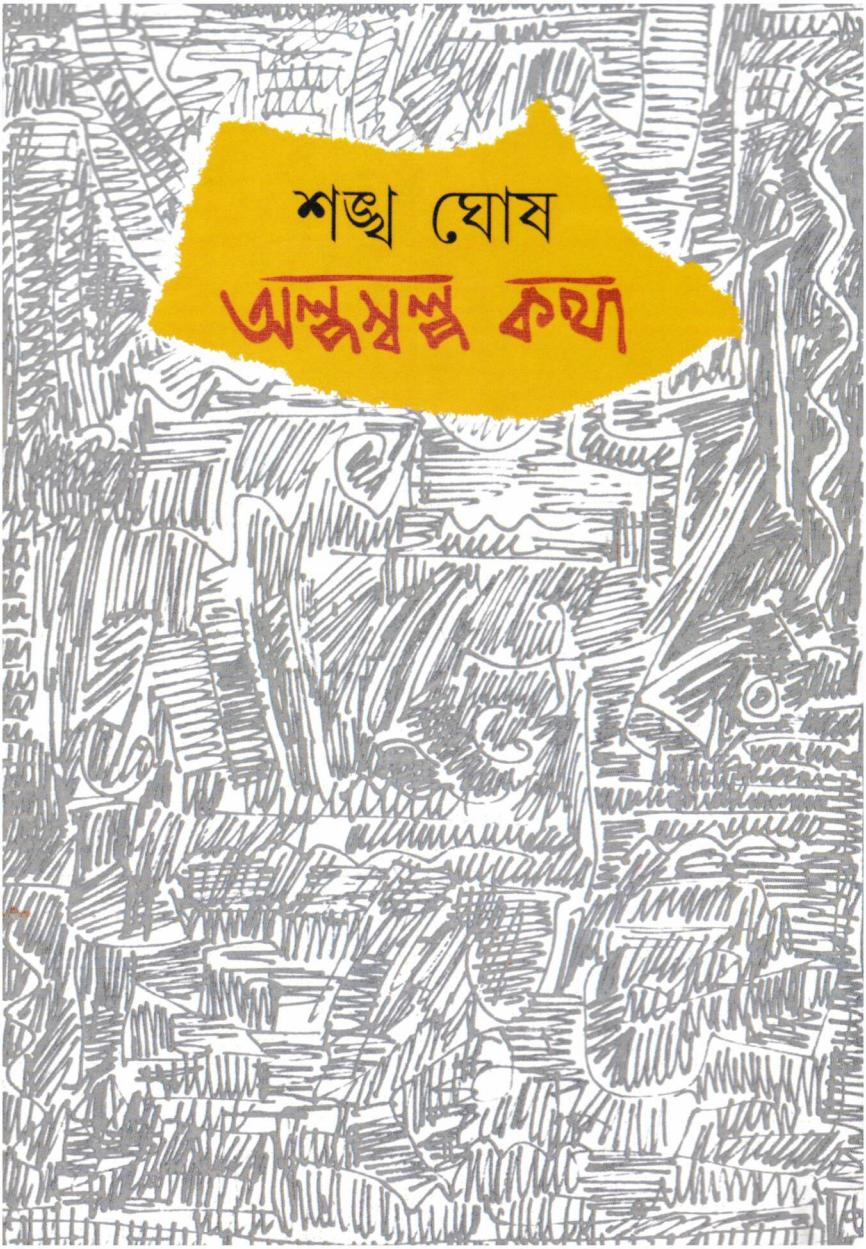

শঙ্খ ঘোষ
অল্পস্বল্প কথা

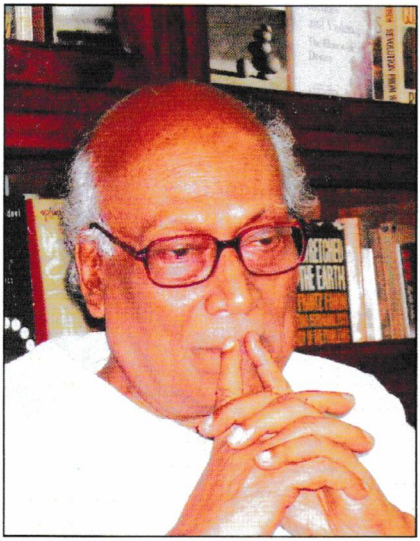

জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২, অধুনা বাংলাদেশের চাঁদপুরে। কুন্তক তাঁর ছদ্মনাম। শিক্ষালাভ করেছেন চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ, পাকশি (বাংলাদেশের পাবনা জেলায়); প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক। অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬) প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবির প্রাপ্ত নানা পুরস্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৭), রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮৯), কবীর সম্মান (১৯৯৮), সরস্বতী সম্মান (১৯৯৮)। অসংখ্য গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা।

ALPASWALPA KATHA
by
SANKHA GHOSH

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা জানুয়ারি ২০১৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
গীতাঞ্জলি হাজরা
পাঠক। ৩৬এ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণসংস্থাপক
অক্ষরবৃত্ত। কলকাতা ৭০০ ০৩৬

মুদ্রক
সাইবার গ্রাফিক্স। কলকাতা ৭০০ ০৩৬

প্রচ্ছদ
দেবাশিস সাহা

২৫০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

সোমেশ চট্টোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচনাকথা

নানা সময়ে লেখা বা বলা এলোমেলো কয়েকটি কথা রইল এখানে। কিছু কথা দেশবিদেশের শিল্পসাহিত্য নিয়ে, আমার সমকালীন নিকটবয়সী কবিলেখককে নিয়ে কিছু কথা, আর এ ছাড়া দু-একটি আত্মপ্রসঙ্গ—এই তিনটি ভাগে সাজানো হয়েছে বইয়ের লেখাগুলিকে। স্নেহভাজন শংকর চক্রবর্তীর প্রীতিময় ইচ্ছেকে মান্যতা দিয়েই করতে হলো কাজটা, যদিও জানি যে বই হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা তেমন-কিছু নেই।

১৮ জানুয়ারি ২০১৬ শঙ্খ ঘোষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

১

কালো মাটির কালো পুতুল ১৫
শিল্প আর জীবন ২৫
শিল্পী আর কবি ৩৭
স্তম্ভিত ইতিহাস নজরুল ৪৮
রবীন্দ্রনাথের না-লেখা ৫৮

২

সংযোগের মানুষ : শিশির ৭১
উদাসীন এক ডাক্তার ৮০
প্রদ্যুম্নর বই ৯৪
দেবেশকে নিয়ে ব্যক্তিগত ১০১
'কৃত্তিবাস'-এর টানাপোড়েন ১১৫
কীরকম ভাবে বেঁচে ছিলেন ১২৯
সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ সুনীল ১৩৫
সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ সুনীল ১৪৪
সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ উৎপল ১৫৩
প্রবহমান মণিভূষণ ১৬৫

৩

জরুরি অবস্থার আতঙ্ক ১৭৫
রেডিয়োর সঙ্গে সম্পর্ক ১৯১
'আস্তিত্বিক বেদনা' ২০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো মাটির কালো পুতুল

জসীমউদ্দীন থেকে শুরু করে শামসুর রাহমান পর্যন্ত কবিরা এখন কোথায়, এই মুহূর্তে? ইয়াহিয়ার সৈন্যেরা না কি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইত্তেফাকের অফিস, ধ্বংস করেছে তার সাংবাদিক কর্মীদের। তাহলে আল মাহমুদ? কোথায় এখন তিনি? বোমায় বিধ্বস্ত রংপুর। কায়সুল হক? ঢাকার জসীমউদ্দীন রোডেও কি ঢুকেছিল ইয়াহিয়ার ট্যাঙ্ক? বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ আজ পনেরো দিনের পুরোনো হলো, এর মধ্যে আমরা জেনেছি কীভাবে সামরিক অত্যাচার প্রথমেই ছুটে যাচ্ছে যে-কোনো বুদ্ধিজীবীর দিকে। ইয়াহিয়ার দল ঠিকই বুঝতে পারে যে এইখান থেকেই জেগে উঠেছে অবিশ্বাস্য এই মুক্তিবাসনার প্রথম আগুন। তাই কেবলই আজ জানতে ইচ্ছে করে বাংলা দেশের কবিরা এখন কে কোথায় আছেন। তাঁরা কি সময়মতো পশ্চাৎপটে সরে এসে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন করছেন কোনো? গ্রাম-গ্রামান্তরকে উদ্‌বোধিত করবার জন্য লিখছেন কোনো নতুন ধরনের কবিতা? প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে স্পেনের গৃহযুদ্ধে যেমন লিখেছিলেন রাফায়েল আলবের্তি আর তাঁর বন্ধুরা? আলবের্তির মতো এঁরাও কি এখন দেখতে পাচ্ছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা দেখতে চাইছেন সারি সারি গ্রামীণ যোদ্ধাদের স্তূপাকার মুখ, যে-মুখে অনেক জানার চিহ্ন নেই, যে-মুখে আছে কেবল বেঁচে থাকবার জন্যই মরবার প্রতিজ্ঞা?

না কি তাঁরা সকলেই এখন এক-একজন তরুণ লোর্কা? ফ্রাঙ্কোর দলবল কেন যে মেরেছিল লোর্কাকে, অনেকেরই কাছে তা স্পষ্ট নয়। এমন নয় যে তাঁর কবিতায় ছিল কোনো বিদ্রোহী রাজনৈতিক ঘোষণা, তাঁকে রাজনীতিক কবি বলার মানে নেই কোনো। তবে কি তাঁকে প্রাণ দিতে হলো শুধু এই জন্যে যে তিনি বলেছিলেন, 'আমি পুরোপুরি স্পেনীয়, স্পেন দেশের বাইরে বাঁচবার কথা ভাবতে পারি না আমি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে চোখবাঁধা সংকীর্ণ কোনো জাতীয়তায় আমি ডুবে যেতে চাই।' এই জন্যে? কিন্তু মানুষের পক্ষে এ তো এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে আমূল লিপ্ত রেখে পরিবেশের ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া নিজেকে, মাটির ভিতর দিকে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে ডালপালা মেলে দেওয়া হাওয়ায়, একই সঙ্গে এই দুই আপাতবিরোধী সত্যকে অর্জন করে নেওয়াই তো মানুষের চরিত্র। তাই বিশ্বতোমুখী হবার জন্যই লোর্কাকে খুঁজতে হয় স্পেন, আবহমান স্পেনের মানুষ, অতীতে-বর্তমানে জড়ানো এক স্পন্দমান জীবন। এ কোনো রাজনীতি নয়, এ হলো আত্ম-আবিষ্কারের সর্বকালীন মানবনীতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ফ্রাঙ্কো অথবা হিটলার অথবা ইয়াহিয়ার সামনে বড়ো প্রতিবন্ধকই হয়ে দাঁড়ায় এই মানবনীতি। তাই আজ ভয় হয় বাংলাদেশের সেই কবিদের জন্য, যাঁরা এতদিন অল্পে অল্পে খুলে দিতে চেয়েছিলেন মুক্তবুদ্ধির পথ। ভয় হয়, কেননা বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানের মূলও হলো এই আইডেন্টিটির প্রশ্নে, দীর্ঘ পঁচিশ বছর যে-প্রশ্নকে সামনে রেখেছিলেন সে-দেশের কবিরা অথবা বুদ্ধিজীবিরা। এটা হয়তো ঠিক যে কৃষকসংকুল দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এখনও সম্পূর্ণ করে জাগোনো হয়নি এই বোধ, বাঙালি হিসেবে তাদের আত্মপরিচয়। কিন্তু এর সম্ভাবনা এতই বেগে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ জুড়ে, যাকে মূল থেকে ধ্বংস করতে না পারলে ইয়াহিয়ার উপায় নেই কোনো। সৈন্যদের প্রথম লক্ষ্য তাই সেইসব মাথা, যে-মাথা থেকে আসা এই বিদ্রোহী ভাবনা 'যাঁরা সতেরো বছর আগে ভেবেছিলেন ইসলাম আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বনিয়ন্তা হবে, তাঁদের স্বপ্ন আজ তাঁদের চোখের সামনেই ধূলিসাৎ হয়েছে' (আবদুল গণি হাজারী, ১৩৭১) অথবা সরাসরি এই জিজ্ঞাসা 'আমাদের সংজ্ঞা কী? আমরা কারা? কাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার?' এবং তার পর, প্রায় লোর্কারা ধরনেরই যেন, 'আমরা পাকিস্তানী, আমরা পূর্ব পাকিস্তানী, আমরা মুসলমান, সবার উপরে আধুনিক মানুষ এবং সামগ্রিক অর্থে আমরা আধুনিক বিশ্বের বাসিন্দা' (আবুল, ফজল, ১৩৭১) অথবা নিতান্তই সরল এই ঘোষণা, 'এ দেশে বাঙালি সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামে একটা সমাজ সত্যি সত্যি আছে বহুকাল যাবৎ' (আবদুল হক, ১৩৭৩)। বাংলাদেশের কবি আশারফ সিদ্দিকী যখন এ সমাজকে এ দেশকে দেখেন এইভাবে—

কলাহীন শিল্পহীন সাহিত্য সংগীতহীন যে জাতি, তাদের
জীবনমৃত্যুর মতো—বিধাতার তারা এক মূর্ত অভিশাপ!
আজ এই শরতের সোনাঝরা আলোকের মাঝখানে বসে
ফুটন্ত পদ্মের মতো নীল আকাশের নীচে যেদিকে তাকাই
মনে হয় গান আর কলা আর শিল্প আর সুরের এ দেশ!

তখন তাঁর কাছে নিজের আর একটা বড়ো আধুনিক পরিচয় জেগে ওঠে। সেই পরিচয় থেকেই অল্পদিন আগে সাহস করে বলতে পেরেছিলেন তরুণ আল মাহমুদ, 'কে জানে ধর্ম উঠে গিয়ে কবিতাই তার স্থান দখল করে কি না!'

না, শুধু ভয় নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই উদ্‌বেগময় মুহূর্তে বসে ওই কবিদের জন্য আজ গর্ববোধ হয়। কবিতার জন্য গর্ব। মনে হয় যেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর জুড়ে গোটা দেশের সত্তাকেন্দ্রটিকে খুঁজে নেবার শপথ নিয়ে এইভাবে এগিয়েছিলেন ওঁরা। তাই সত্যি সত্যি অনেক সময়ে কবিতাই কি হয়ে ওঠে ওদেশের ধর্ম? তা যদি না হতো তবে কী ভাবে ওদেশের জনকর্মীরা এমন করে দেখতে পেলেন বাংলার মুখ? আমাদের এই রাজনৈতিক ভ্রষ্টতার পরিবেশে কি কল্পনা করা যায় যে সমূহ এক জনউত্থানের সামনেও স্লোগান হয়ে উঠতে পারে জীবনানন্দের কবিতা? 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই লাইনের মায়ামমতা যে আমাদেরও কখনো স্পর্শ করেনি তা নয়, কিন্তু আমরা যেন ধরেই নিয়েছি এ হলো বানিয়ে তোলা এক জগৎ, কবিতার জগৎ, এর প্রভাব শুধু ছোটো এক পাঠকসম্প্রদায়ের ওপর, এর সঙ্গে কখনোই যোগ হতে পারে না রাজনৈতিক জাগরণের। কবিতা যে আমাদেরও এখানে মিছিলে-নির্বাচনে কাজে লাগেনি কখনো তা নয়, সুকান্তের কোনো কোনো লাইন আজ দেয়াললিপির কল্যাণে অনেকেরই জানা। কিন্তু সে হলো বিশেষভাবেই বিদ্রোহের ঘোষণা, রাজনৈতিক উত্তেজনারই কাব্যরূপ। এ নিয়ে আমাদের কোনো বিস্ময় বা প্রশ্ন নেই। আমাদের বিস্ময় শুধু এই যে, ধ্বংসময় আক্রমণের মহূর্তেও তবে ভালোবাসারই কথা উচ্চারণ করতে পারি আমরা? জানাতে পারি নিবিড় মায়াময়তা? অন্তত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সেই সাহস ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাদের, নতুন ক'রে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে অল্প কথাই অনেক বড়ো কথা, নিচু গলাই অনেক জোরালো গলা, ভালোবাসতে পারাটাই সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব।

এ নয় যে এই ভালোবাসা তাদের অস্ত্রধারণে বাধা দিয়েছে কোনো। এর দ্বারা তারা নির্বীর্য কোনো আত্মক্ষয়ে ডুবে গেছে এমন নয়। এরা শুধু আমাদের সামনে তুলে দিয়েছে সেই সাহস, যে-সাহসে বলা যায় যে লক্ষ্যকে কখনো আমি ভুলি না, তাকে সঙ্গে রাখি পাশে পাশে। আমাদের দেশের রাজনীতি তার নিজের লক্ষ্য থেকে কখন যে উচাটন হয়ে সরে যায় তা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনেও থাকে না, কখনোই তার মনে থাকে না বাংলার মুখ, হয়তো সে ভাবে যে একবার রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধ হবার পর তখন দেখে নেওয়া যাবে সেই মুখখানি। সে জানতেও পারে না যে গোপনে গোপনে দিনে দিনে কেমন করে সে-মুখ ক্ষইয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের রক্ত থেকে, দুস্তর বিচ্ছেদ ঘটে গেছে কবিতায় আর রাজনীতিতে।

রাজনীতি-মনস্কেরা অবশ্যই বলবেন যে এই বিচ্ছেদের দায়িত্ব হলো কবির। কবিরই অপরাধ, তিনিই সরে গেছেন তাঁর নিভৃত আপন গোত্রে, ঠিকভাবে তিনি গড়ে তোলেননি দেশের কবিতা। কিন্তু কাকে বলে দেশের কবিতা? কাকে বলে বিপ্লবের কবিতা? সে কি কেবল লড়াইয়ের উশকানি-জাগানো ফুসফুসের শক্তিপরীক্ষা? সে কি কেবল রাজনৈতিক ইশ্‌তেহারকে পদ্যে বাঁধার কৌশল? তা যদি হতো তাহলে কমিউনের ছেলেদের কাছে অল্প হেসে বলতে হতো না লেনিনকে, 'মায়াকভ্‌স্কি? কিন্তু আমার মনে হয়ে পুশ্‌কিন আরো ভালো'। ক্রুপস্কায়া যে জানিয়েছেন সাইবেরিয়ার দিনগুলিতে লেনিন কবিতা পড়তে ভালোবাসতেন লের্মন্তফের, হাইনের—সেইসব ঠান্ডা, ভালোবাসার, ভালো লাগার কবিতা—এতে আমরা অবাক হই না। কেননা চারপাশ এই সুন্দর মুখশ্রীকে দেখতে পাবার জন্যই তো বিপ্লবের আয়োজন। তাই বিপ্লবের পথেও আমি ভুলতে পারি না সেই মুখশ্রীকে। না, এ কোনো নারীর মুখশ্রীর কথা নয়। কিন্তু নারীরও বটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের কবিতা লিখব ভেবে এই ভুলটাই আমাদের ঘটে যায় বারবার। আমরা একটা ধরাবাঁধা নকশার মধ্যে ঠেসে নিয়েছি দেশাত্মবোদের চেহারা। বলেই দেওয়া যায় যে এ-কবিতায় বলা হবে, অত্যাচারী, ঢের হয়েছে, তোমার সীমাহীন লাঞ্ছনার অবসান হবে একদিন, সামনে আছে ভোর। কবিতায় লাল এই পূর্বদিগন্তের ছবি দেখতে পেলেই আমার মনে পড়ে যায় কী বলেছিলেন একবার এরেনবুর্গ। ভারি বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি, রুশদেশে কি তাহলে মেঘ করে না কখনো? বিপ্লবোত্তর যে-কোনো উপন্যাস খুললেই কেন তবে দেখতে পাই কেবলই টাটকা ঝকঝকে দিন, আকাশে ঝলমলে সূর্য? আর, উলটোভাবে চম্‌কে গিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ভিয়েতনামি গেরিলাযোদ্ধার হাতে কবিতার বই দেখে ধারণা হয়েছিল তাঁর, কতই-না জ্বালাময় আগুন থাকবে ওর মধ্যে। তার বদলে মলাটে ছিল স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক ছবি, কবিতায় ছিল সহজ ভালোবাসার আবেগ!

সেই ভালোবাসারই কথা এতদিন ধরে বলেছেন বাংলাদেশের কবিরা। আমাদের চল্‌তি অর্থে দেশপ্রেমের কবিতা যে তাঁরা লেখেননি তা নয়, কিন্তু সেইখানে এর সামর্থ্য নয়। এর সমস্ত মহিমা হলো দিনে দিনে গড়ে তোলা এক আত্মসন্ধানের ব্রতে। আজ এই মুহূর্তে বসে আমরা জানি না বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ আরো কত জটিল পথ বেয়ে তবে তার কাঙ্ক্ষিত পরিণামে পৌঁছবে, আরো কত মূল্য দিতে হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মানুষকে, কিন্তু বিপ্লবের এই যে নিঃসন্দিগ্ধ প্রথম মূর্তি জেগে উঠেছে দেশ ভরে, তার মস্ত প্রেরণাই ছিল এক আত্ম-আবিষ্কারে, গোটা জাতির আইডেন্টিটির প্রশ্নে। আমাদের গর্ব, এ আত্মপরিচয়ের পথ তৈরি করছিল বাংলাদেশের কবিতা।

সীমান্তের প্রহরা ডিঙিয়ে যতটুকু বইকাগজ আমাদের হাতে পৌঁছয়, তার মধ্যে সবাই আমরা লক্ষ করেছি এইসব সন্ধান। আর তুলনা করে ভাবি, পদ্মার এপারে বসে সেই সন্ধানকে কতই অবজ্ঞা করেছি আমরা। একথা অবশ্য সত্যি যে ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কারণে ওদের পক্ষে যত অনিবার্য ছিল এই প্রশ্নে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, যত সরাসরি দেখা হয়েছিল ওদের শোষিত চেহারা, আমাদের পক্ষে ততটা নয়। মধ্যখানে হা-হা করা ব্যবধান নিয়ে ধর্মে ভর করে জেগে উঠল যে নতুন রাষ্ট্র, তার অধিবাসীদের পরিচয় কী? এ দেশ যদি নতুন, তবে নতুন দেশবাসীর সত্তা কী রকম? কী তার ঐতিহ্য, কী তার ভবিষ্যৎ? ঠিক, এই বুঝে নেবার চেষ্টা থেকে ওদেশে যত স্বাভাবিক ছিল অল্পে অল্পে রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র করে ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র করে অবশেষে ভাষার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো, আমাদের পক্ষে তত নয়। কেননা আমাদের এই চিবিয়ে- ইংরেজি-বলা বুকনি-সর্বস্ব অঞ্চলে আমরা ভেবে নিয়েছিলাম যে স্বাধীনতার পর আমাদের জানা হয়ে গেছে ভারতীয়তা, যেন আর আত্ম-আবিষ্কারের কোনো দায় নেই, যেন গত শতাব্দীতেই আমরা চুকিয়ে নিয়েছি সে-সব বোঝাপড়া, যেন 'ভারতীয়'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটির সত্যি সত্যি কোনো তাৎপর্য আমাদের কাছে আছে। এমনও অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন ভারতীয় কোনো বাধ নিজের মধ্যে অনুভব করা মানেই এক সংকীর্ণ হীনতায় ডুবে যাওয়া, বিশ্বমানবতার পরিপন্থী এক আয়োজন। এই মুহূর্তে এঁদের কথা আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি কেবল তাঁদের কথা যাঁরা ধরে নিয়েছেন যে এ-বোধ আমরা জন্মসূত্রেই পেয়ে আছি, জন্মসূত্রেই আমার মুখে আছে আমার ভাষা, যেন এ নিয়ে কোনো ভয় নেই আমার।

তাই ভাষাকে আমাদের নতুন করে ভালোবাসতে হয়নি কখনো। আর এইখানেই আছে সর্বনাশের বীজ। আমাদের কবিতাও বড়ো নির্লজ্জভাবে ধরে রেখেছে ভাষার প্রতি আমাদের এই সর্বনাশা ঔদাসীন্যের ছবি। যেমন এক দেশহীন দেশে আমাদের বসবাস, তেমনি এক নির্ভাষ ভাষায় আমাদের বাচালতা। যেমন আমাদের কাজেকর্মে পথচল্‌তি জীবনের হাজার কোণে, তেমনি আমাদের শিল্পরচনায়— আমরা যেন ভুলে গেছি যে ভাষা হলো আমার সত্তার নিঃশ্বাস। তাই সহজেই আমাদের গলায় অথবা কলমে কেবলই চলে আসে অনুপলব্ধ মিথ্যা উচ্চারণ। ভাষাকে আমরা ভেবেছি কাজ চালাবার একটা উপায়মাত্র, মনে রাখিনি যে এই হলো এক সমগ্র আত্মপ্রকাশের বাহন। আমাদের আত্মার সঙ্গে আমাদের ভাষা আনন্দের তাপে যুক্ত হয় না আর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে, এই যোগেই আছে বাংলাদেশের কবিতার শক্তি। যুদ্ধজনিত আমাদের এই মথিত আসক্তির মুহূর্তেও আমি ভুলে যাচ্ছি না যে ভুল, দূর্বল, নিষ্ফল কবিতাও অজস্র লেখা হয়েছে পদ্মার ওপারে, ভুলে যাচ্ছি না যে শিল্পবিচারের মহিমময় রচনা অল্পই আমরা পড়তে পেরেছি এই পঁচিশ বছরে। কিন্তু তবু, এই যে এক সরল সত্যের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পেরেছেন ওদেশের কবিরা, এ থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা পেয়ে গেছেন সূচনা। এই সূচনার আনন্দে প্রায় কিশোরের সারল্যে আল মাহমুদের মতো কবিদের বুক নড়ে উঠাছ 'জিয়ল মাছের ভরা বিশাল ভাণ্ডের মতো', অথবা দেশপ্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে তাঁদের প্রিয়মুখ, স্তবের মতন বলে উঠছেন তাঁরা, 'কালো মাটির কালো পুতুল তুমি আমার'! কালো মাটির এই কালো পুতুলেই তাঁরা আজ দেখেছেন তাঁদের বাংলার মুখ, এইখানে তাঁদের জয়!

১৯৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্প আর জীবন

বাঙালি যে-কবির শতবর্ষ নিয়ে উদ্দীপনা এখনও ফুরোয়নি সেই জীবনানন্দ একটি কবিতায় লিখেছিলেন : 'মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর/ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার/ভাই আমি।' পৃথিবীর এক প্রান্তে, আরো এক কবির শতবর্ষ চলছে এই সময়, একই বছরে দুই কবির জন্ম, আর আর্জেন্টিনার সেই কবিও লিখেছিলেন একবার 'আমি আজ আমি, আর আমি আজ সে-ও, যে-মানুষ/মরে গেছে, যার রক্ত আর যার নাম/আমারই নিজের।'

এমন নয় যে এ-দুই কবির মধ্যে অন্য কোনো সংযোগ আছে, অন্য কোনো সমতা। আর্জেন্টিনার স্পেনীয় ভাষায় সেই কবি, হোর্হে লুইস বোর্হেস, জীবনানন্দের মতোই হয়তো বলতে পারতেন যে কবিতা 'শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।' বলতে পারতেন নয়, বলেওছিলেন একবার 'যে-কবিদের বার বার ফিরে পড়া যায়, তাঁদের লেখায় থাকে এ-দুয়ের সহাবস্থান।' অবশ্য, কল্পনা বা ইম্যাজিনেশন শব্দেরই যে ব্যবহার তিনি করেছিলেন তা নয়, তিনি লিখেছিলেন 'স্পিরিট'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু 'স্পিরিট' আর মেধার এই সহাবস্থান ছিল কি তাঁর নিজের কবিতায়? ভের্‌লেনের কবিতাকে তাঁর মনে হয়েছিল বিশুদ্ধ 'স্পিরিট' থেকে পাওয়া, আর এমার্সন ছিলেন তাঁর কাছে ইন্‌টেলেকচুয়াল কবি। আর এই পর্যন্ত বলে তিনি এও জানান যে তাঁর নিজের কবিতার লক্ষ্য ওই দ্বিতীয় জগতেই।

হয়তো একটু ভুল বলা হলো। ১৯২৯ সালে লেখা তাঁর তৃতীয় কবিতা বইয়ের (Cuaderno San Martin/San Martin Copybook) ১৯৬৯ সালে লেখা ভূমিকায় ওই কথাটা বোর্হেস লিখছিলেন তাঁর বিশেষ এই বইটির বিষয়ে। বলা যেত, কবিতার এই চরিত্রটা ছিল তাঁর পুরোনো দিনের অভ্যাস, নতুন সময়ের নয়। কিন্তু ১৯২৩ থেকে শুরু করে ১৯৮৫ প্রকাশিত তাঁর চোদ্দোটি কবিতার বই পর্যন্ত পড়তে পড়তে বোর্হেসের কবিতার এই মেধাবী পরিচয়টাই প্রধান হয়ে জেগে ওঠে।

মেধাবী, কিন্তু জটিল নয়। বস্তুত, 'ল্যাবেরিন্‌থ'-খ্যাত বোর্হেস বিষয়ে অনেক পাঠকেরই মনে জটিল আবর্তের একটা কল্পিত মূর্তি তৈরি হয়ে যায়, আর সেই মূর্তির সৃষ্টিতে বড়ো একটা ভূমিকা হয়তো থাকে সমালোচকদেরই। রিচার্ড বার্গিনের সঙ্গে ধারাবাহিক এক কথোপকথনে বোর্হেস এ নিয়ে তাঁর বিস্ময়ও জানিয়েছিলেন একবার। বলেছিলেন, এঁরা ব্যাপারটারকে বড়ো বেশি আত্মসচেতন করে তোলেন, আর সেইসঙ্গে বড়ো বেশি ঘোরালো। জটিলতা বরং বোর্হেসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে দুর্বলতারই একটা চিহ্ন হয়ে আসে। হেনরি জেম্‌স্ আর কাফ্‌কার মধ্যে একটা তুলনার কথা তিনি বলেছিলেন বার্গিনকে। দুজনের মধ্যে কোথাও একটা সামঞ্জস্য আছে, মনে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে হয়েছিল : জেম্‌স্ অনেক জটিল কাফ্‌কার চেয়ে, আর সেইটেই তাঁর দুর্বলতা। 'সম্ভবত এই জটিলতার অভাবের মধ্যেই আছে কাফ্‌কার শক্তি।'

এই শেষ কথাটায়, লেখার আদর্শ বিষয়ে বোর্হেসের নিজস্ব ধারণার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। অথচ, লেখা কীরকম হবে, কী হওয়া উচিত, এ নিয়ে কোনো তত্ত্বের কথা না কি বলতেই চান না তিনি। তাঁর কবিতাবইগুলির একটা বাড়তি আকর্ষণ বইয়ের সঙ্গে যুক্ত যে ছোটো ছোটো ভূমিকাগুলি, সেসব ভূমিককায় বোর্হেস কেবলই লেখন যে তাঁর কোনো নন্দনতত্ত্ব নেই, কোনো সাহিত্যিক 'স্কুল'-এ বিশ্বাস নেই তাঁর। বলেন এ-কথা, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটিতেই জানিয়ে দেন কী তিনি করতে চান কবিতায়, কিংবা কী করা উচিত। চমকপ্রদ শব্দ নয়, তিনি নির্বাচন করে নিতে চান সহজ-সাধারণ শব্দ; শব্দকে তার আদিম শক্তি ফিরিয়ে দেওয়া কবির কাজ। কবিতার মধ্যে তিনি জুড়ে দিতে চান খানিকটা অনিশ্চয়ের অংশ, কেননা কবিতা ফিরে যেতে চায় প্রাচীন জাদুতে। দুটো প্রধান দায় আছে কবিতার : বিশেষ এক মুহূর্তকে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া আর তাকে প্রায় শারীরিক ভাবে স্পর্শযোগ্যতা হয় নিয়ে যাওয়া, সমুদ্রের সান্নিধ্য যেভাবে স্পর্শ করে যায় আমাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এসব বলতে বলতে যখনই তাঁর মনে হয় শোনাচ্ছে যেন তত্ত্বের মতো কিংবা ইস্তাহারের মতো, তখনই বোর্হেস আরো একবার রাশ টেনে মনে করিয়ে দেন : আমি কোনো নন্দনতত্ত্বের ঘোষণা করছি না।

টুকরো টুকরো করে যা কিছু তিনি বলছেন সেসব জড়ো করেই তো তৈরি হয়ে ওঠে একটা তত্ত্ব? আর সেইজন্যেই 'কাব্যতত্ত্ব' নামের এক কবিতাতে এ-রকম লাইনও তিনি লিখে ফেলতে পারেন 'যে পারে নিজের কাছে নিজেদের মুখ খুলে দিতে/শিল্পকেও হতে হবে ঠিক সেই দর্পণের মতো।' তাই যদি হলো, 'হতে হবে'ই যদি বলা হলো, সে তো একটা নির্দেশনামাই হয়ে উঠল তবে?

ওই কবিতাটিরই মতো, একটি ভূমিকারও অংশে লিখেছিলেন বোর্হেস · মৃত্যুর অল্প আগে শিল্পী আবিষ্কার করেন যে, ধৈর্য ধরে এতদিন রেখার যে গোলকধাঁধা তৈরি করেছেন তিনি, সে হলো তাঁর নিজেরই মুখের ছবি। তাই আশ্চর্য নয় যে সরাসরি 'আমি' নাম দিয়েই তাঁর অনেকগুলি লেখা আমরা পাব 'বোর্হেস আর আমি' 'বোর্হেসরা' 'আমি' 'সেই আমি'; কিংবা দৃষ্টিহারা হয়ে যাবার পরে 'অন্ধ' নামেই অনেক কবিতা। অবশ্য *El hacedor (The Maker)* নামের কবিতাবইয়ের মধ্যে থাকলেও 'বোর্হেস আর আমি'কে কবিতা বলতে নিশ্চয় অনেকের বাধবে, কিন্তু কবিতাসংকলনের মধ্যে এ-রকম টুকরো গদ্যগুলিকে অর্ন্তগত করতে কোনো বাধা বোধ করেননি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোর্হেস, কেননা তিনি মানতেন না এদের কোনো জল-অচল-ভাগ। গদ্য আর পদ্যের দূরত্ব তাঁর কাছে এতই সামান্য যে কিছুমাত্র লয়ভঙ্গ না-করে দুয়ের সহাবস্থান সম্ভব বলে ভাবতেন তিনি।

আমি-কেন্দ্রিক কবিতাগুলিতে যে আত্মমুখচ্ছবি খুঁজতে চান বোর্হেস, যে পরিচয়, সে কেবল তাঁর ব্যক্তিপরিচয় নয়, সে হলো এক জাতিপরিচয়, দেশপরিচয়। নইপল একবার লিখেছিলেন যে বোর্হেসের কবিতায় পঞ্চাশ বছর ধরে একই ভাবনা ফিরে ফিরে আসে তাঁর সামরিক পূর্বপুরুষ, যুদ্ধে তাঁদের সংহার, সমগ্র মৃত্যু, সময়, আর পুরোনো বুয়েনোস এয়ারেস। হয়তো এইটুকুই তাঁর কবিতার সীমা নয়, কিন্তু এটা ঠিক যে নইপলের বলা ওই জগৎটা বোর্হেসের কবিতার প্রধান একটা জায়গা জুড়ে থাকে, অন্তত *El otro, el mismo (The Self and the Other)* বইয়ের ভূমিকায় বোর্হেস নিজেই সে-বইয়ের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন বুয়েনোস এয়ারেস, পূর্বপুরুষদের অভ্যাস, সময় আর আত্মর সংঘাত। এই পূর্বপুরুষের সূত্র ধরে আত্মকে জানতে গিয়ে তাঁকে বলতে হয় যাঁদের কথা তেমন কিছুই জানেন না তিনি, প্রেতের মতো যাঁরা নিজেদের সব অভ্যাস তাঁর শরীরে বুনে দিয়ে যান, সেই পর্তুগিজ প্রাক্তনেরা 'তাঁরা যেন সেই রাজা লুপ্ত যিনি রহস্যের তীরে/অথচ সকলে ভাবে মৃত নন আসবেনই ফিরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই অতীত দিয়ে বর্তমানকে কীভাবে চিহ্নিত করবেন কবি? বা, অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁর চারপাশের আর্জেন্টিনার সঙ্গে কীভাবে মেলাবেন তার ঐতিহ্যকে? কী থেকে তাঁর সংস্কৃতির পরিপোষণ পাবেন তিনি? তাঁদের যৌবনদিনে এই একটা প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠেছিল অর্জেন্টিনায়, বা, কেবল আর্জেন্টিনাতেই নয়, সমগ্র লাতিন আমেরিকাতেই। রক্তের মধ্যে পূর্বপুরুষদের যে প্রচ্ছন্ন স্মৃতিপ্রবাহ, তার থেকে সচেতনভাবে সরে আসাই কি কাজ? আর্জেন্টিনার নিজস্ব জাতীয়তার কোনো গণ্ডি গড়ে তোলাই কি লক্ষ্য? *Sur* পত্রিকার পত্তন করবার সময়ে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোরা আর্জেন্টিনার এই নিজস্বতা খুঁজে পাওয়াকেই একটা ব্রত হিসেবে স্থির করে নিয়েছিলেন। আর, অন্যদিকে, *Sur* পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক বোর্হেস বলছিলেন কেবল আর্জেন্টিনা নয়, কেবল স্পেন বা পর্তুগালের গণ্ডি নয়, সমগ্র ইয়োরোপ থেকে বয়ে আসছে তাঁর ঐতিহ্য। কিংবা, কেবল ইয়োরোপ নয়, সমগ্র বিশ্বই সেই ঐতিহ্যের উৎস। আর সেইভাবে দেখতে পেলে গণ্ডিহীন একটা বিরাট সময়প্রবাহকে নিজেদের মধ্যে আমরা অনুভব করতে পারব বলে ভাবেন বোর্হেস।

হয়তো সেইজন্যেই, বেশ সচেতনভাবেই তাঁর কবিতা হয় তিনি এনে দিতে চান গোটা ভৌগোলিক জগৎ, বলতে পারেন যে তাঁর নিয়তি হলো এই পৃথিবীর নানা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো, আসলে নানা নামে একটিই মাত্র সেই সমুদ্র; বলতে পারেন যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি হয়ে ওঠেন এডিনবরা জুরিখ করডোবা কলম্বিয়া টেক্সাসের অংশ; বহু প্রজন্ম পেরিয়ে তিনি চলে যেতে পারেন তাঁর পূর্বপুরুষদের দেশে, আন্দালুসিয়ায় পর্তুগালে, কিংবা সেইসব অঞ্চলে যেখানে ডেনদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল স্যাক্সনদের। একটি 'এলিজি'তে (একাধিক 'এলিজি' আছে তাঁর) এইভাবেই তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন নিজের। কোষগ্রন্থে মানচিত্রে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি দেখেছেন মৃত্যু, দেখেছেন ভার-নিয়ে-নেমে-আসা ভোর, অন্তহীন সমতলভূমি, নক্ষত্রজাল। আর এইসব বলতে বলতে কতবার তিনি চলে আসেন আমাদের বাংলাতেও, কিংবা গঙ্গায়। 'অন্য বাঘ' নামের এক কবিতায় বাঘের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার এক সমুদ্রবন্দর থেকে তার পিছু নিতে থাকেন গঙ্গার ধার পর্যন্ত; অথবা 'প্রাসাদ' নামের এক প্যারেব্‌ল্‌-এ প্রাসাদের বাগানে অলিন্দে সিঁড়িতে ঘরে কিংবা ঘরের-ভিতরে-ঘরে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় যে সংখ্যায় তারা গঙ্গাতীরের বালুকণার চেয়ে কম নয়, একটি বেড়ালের কবিতা লিখতে গিয়ে (১৯৬৯ সালের পরে লেখা) বলেন, জ্যোৎস্নায় যখন তাকে চিতাবাঘের মতো দেখায়, যখন আমরা দূর থেকে দেখি তাকে, আমরা বৃথাই তাকে খুঁজি, কেননা গঙ্গারও চেয়ে সুদূর তার নিঃসঙ্গতা, তার রহস্য; হলুদ সূর্যাস্তকালে তাঁর মনে পড়ে 'বাঘের সোনালি', লোহার খাঁচার গোলকধাঁধায় কতবার তিনি দেখেছেন পেশল শরীরে এপাশ-ওপাশ ঘুরে-বেড়ানো বাংলার বাঘ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঘ। এই আরেক প্রসঙ্গ, বোর্হেসের কবিতায় যা বারে বারেই ফিরে আসে। আসে, কেননা এর মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরতে চান শিল্প আর জীবনের সম্পর্কগত জটিল একটা প্রশ্ন। ওই-যে বাঘটিকে খাঁচার মধ্যে ঘুরতে দেখেন বোর্হেস, তার থেকে তো মনেই পড়তে পারে ব্লেকের সেই ঝলমলে বাঘটিকেও। তা হলে, ঠিক-ঠিক বাঘটিকে কি আর দেখতে পাচ্ছি আমি? 'অন্য বাঘ' কবিতায় প্রশ্নটাকে একটু ভিন্নভাবে তুলছেন তিনি। বাঘ নিয়ে কবিতা লিখছি, কিন্তু লিখবার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে উঠছে কয়েকটি শব্দ, শব্দমালা, বাঘটা আর বাঘ রইল না। সাহিত্যের কিছু প্রতিমা দিয়ে, ছায়া দিয়ে আর প্রতীক দিয়ে গড়ে উঠল সেই বাঘ, অনেকাংশে আমার জ্ঞান দিয়ে তা পাওয়া। বাংলায় বা সুমাত্রায় যে ভয়ংকর বাঘ ঘুরে বেড়ায় তা ভালোবাসার আলস্যের বা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর পথে, কবিতার মধ্যে সে আর নেই। সে হয়ে উঠেছে অন্য এক বাঘ। আর তার পরে, এ-দুয়ের বাইরে, বোর্হেসের মনে পড়ে তৃতীয় এক বাঘেরও কথা, কবিতার মধ্যেও যে নেই, যে আছে তাঁর স্বপ্নে, সমস্ত পুরাণকথার বাইরে মানুষের ভাষার অভ্যন্তরীণ কোনো বিন্যাসের মধ্যে।

যে-কথোপকথনের কথা আগে বলেছি, তার মধ্যে বোর্হেস মন্তব্য করেছিলেন যে তিনটিতেই শেষ নয়, পাঠককে তিনি এই বোধে পৌঁছে দিতে চান যে কবিতাটি আসলে অন্তহীন। কবিতায় কেবলই আমি ছুঁতে চেষ্টা করব বাস্তবের ওই বাঘটিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কেবলই সে সরে সরে যাবে। এটা কি শিল্পেরই একটা ব্যর্থতা? অন্তত, জীবনকে বা বাস্তবকে শিল্পের মধ্যে যে ধরে দেওয়া যায়, সেই ধারণার ব্যর্থতা এটা। আর কথাটা কেবল এই একটি কবিতাতেই যে বলেছেন বোর্হেস তা নয়, এরও আগে লেখা 'হলুদ গোলাপ'-এর প্যারেব্‌ল্‌-এও আছে সেই একই প্রসঙ্গ। এমনকী, বোর্হেসের মনে হয়েছিল যে 'অন্য বাঘ' লিখতে গিয়ে তিনি 'হলুদ গোলাপ'কেই ফিরে লিখছেন আবার। মুর্মূষু মারিনে-র সামনে এক মহিলা হলুদ একটি গোলাপ রেখে গেছেন ফুলদানিতে, সেইটে দেখতে দেখতে কবিতার লাইন মনে পড়ল মারিনো-র, মনে হলো অ্যাডামও তো এইভাবে স্বর্গোদ্যানে দেখেছিলেন ফুল। এ ফুল তবে তার শব্দের মধ্যে নয় শুধু, এ বেঁচে আছে আদ্যন্তহীন এক সময়প্রবাহের মধ্যে। মনে হলো তাঁর, কোনো-কিছুকে আমরা হয়তো একটা নাম দিতে পারি, বলতে পারি তার কথা, কিন্তু যথাযথভাবে তাকে প্রতিফলিত করতে পারি না কিছুতেই। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে যাকে মনে করতেন বোর্হেস, সেই *'El Golem* (The Golem) কবিতাটিরও মধ্যে আছে এই ব্যর্থতাবোধের কথা, শিল্পপ্রকৃতির কথা, এই কথা যে

আগে, পরে, ইতিমধ্যে, কাল, আপাতত,
তুমি, আমি, ওরা, তারা, ডান কিংবা বাম—
অল্পে অল্পে জানল তারা এইসব নাম
জড়িয়ে নিয়েছে জালে আমাদেরই মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এইভাবে, একটার পর একটা নাম দিতে দিতে বা প্রতীক তৈরি করতে করতে বস্তু থেকে দূরবর্তী হয়ে কোথায় পৌঁছব আমরা?

ওই কথোপকথন-কালে লেখা হয়ে যায়নি বলে বোর্হেস জানাতে পারেননি আরেকটি কবিতার কথা। সে-কবিতায়, নিশাপুরের আত্তার একটি গোলাপ হাতে নিয়ে নীরবে ভাবছিলেন সব কিছুরই মধ্যে আছে তার অসীমতা, আর তাই

তুমি, তুমিই সংগীত,
নদী মহাকাশ আর প্রাসাদ বা দেবদূত তুমি,
অন্তহীন হে গোলাপ, বদ্ধমূল, সীমারেখাহারা,
ঈশ্বর যা দেখাবেন, আমার মৃত্যুর চোখ দিয়ে।

'হলুদ গোলাপ' কবিতায়, মৃত্যুর আগে মারিনো-র মনে যে বোধ এসে পৌঁছেছিল, তার সঙ্গে কবি মিলিয়ে নিয়েছিলেন হোমার বা দান্তেকেও। বাস্তব আর শিল্পের সম্পর্ক-বিষয়ে তাঁরাও নিশ্চয় ঠিক একই ব্যর্থতার ভাবনায় পৌঁছেছিলেন মৃত্যুর আগে, মনে হয়েছিল বোর্হেসের। আর সমস্ত-এই মৃত্যুকথা বস্তুত তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল নিজেরই মৃত্যুবোধে, ১৯৭২ সালের পরে লেখা অন্য একটি 'এলিজি'তে যেমন তিনি বলেন

আমার মৃত্যুর কথা ভাবি আমি, শেষ অবসান,
যেখানে কোথাও কোনো অশ্রু নেই,
ভস্মাধার নেই।

ইতিহাসের সমস্ত গতকালের ভার, যা-কিছু ঘটেছিল বা যার স্বপ্ন দেখা হয়েছিল সব যেন ব্যক্তিগত কোনো অপরাধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাপ হয়ে জমে থাকে তাঁর ওপর, আর তিনি ঘুরে বেড়ান সমুদ্রে সমুদ্রে, দেশে দেশে, মেরুতে মেরুতে। দেখেন বাঘ গোলাপ প্রাসাদ। আর ভাবেন যে শব্দের মধ্যেই তারা যদি পরমতা পেত, তাদের অস্তিত্বের তো আর দরকারই থাকত না তবে! ভাবেন, শিল্পের মধ্যে ধরা দিতে পারে না বাস্তবের মুখ, ভাবেন এরা দুই স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা। বাঘ আর অন্য-বাঘ, গোলাপ আর অন্য-গোলাপ, প্রাসাদ আর অন্য- প্রাসাদ—একটি আরেকটির পরিবর্ত নয়। পরিবর্ত হিসেবে নয়, শিল্প দাঁড়িয়ে থাকে তার নিজেরই ওপর ভর করে।

সেইসঙ্গে তিনি মনে করেন প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে একটা নকশা আছে কোথাও, যে অর্থে দিনের রাতের ঋতুবদলের বা জন্মমৃত্যুর ছক তৈরি হয় সেই অর্থে নয়, আরো কোনো গূঢ়তর একটা নকশা আছে বলে বিশ্বাস হয় বোর্হেসের। হয়তো তা দেখতে পান না শেষ পর্যন্ত, তবু কেবলই খুঁজে বেড়ান তাকে। এ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ যে এই বছরে (১৯৯৯) প্রকাশিত তাঁর নির্বাচিত কবিতাসংকলনে অন্তিম কবিতাটির নাম *'La trama'* (The Web)। সে-কবিতায় তিনি প্রশ্ন করেন কোথায় তাঁর মৃত্যু হবে, কোন্ শহরে। একটির পর একটি নাম করে যান সম্ভাব্য সেসব শহরের পুরোনো স্মৃতি বা অভিজ্ঞতাসুদ্ধ। কোন সময়ে মৃত্যু হবে তাঁর? সে কি পারাবত-রঙা কোনো প্রদোষ, যখন সব রং ঝরে যেতে থাকে, নাকি বেলা দুটোয়? অন্যেরাই তা জানবে কখনো, আর ভুলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে তারপর। কবিতাটি শেষ হয় এইভাবে : এসব প্রশ্ন তিনি করছেন কোনো আতঙ্ক থেকে নয়, বরং অধীর এক আশা থেকে, এই আশা যে সবকিছুই জড়ানো আছে কার্যকারণের কোনো নিয়তিজালে ('বিচিত্র ছলনাজালে'?), যদিও তাকে দেখতে পায় না কোনো মানুষ, এমনকী দেবতারাও।

১৯৯৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী আর কবি

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, আধুনিক বাংলা কবিতার একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন আমাদের অগ্রগণ্য এক কবি, বুদ্ধদেব বসু। অনেককে অবাক করে দিয়ে সেই সংকলনে তিনি অন্তর্গত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনাংশ। শিল্পী হিসেবে, শিল্প-আন্দোলনের নেতা হিসেবে, সকলেই তাঁকে জানেন। গদ্যলেখক, হিসেবেও তাঁর সম্পূর্ণ এক নিজস্ব শৈলী অনেকের কাছে পরিচিত। কিন্তু সুনির্বাচিত এমন একটি কবিতা-সংকলনে তাঁর কোনো কবিতাও দেখতে পাওয়া যাবে, একথা তখন কল্পনা করেননি কেউ।

রচনাটি বুদ্ধদেব অবশ্য সংগ্রহ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কোনো গদ্যলেখা থেকে। সে-লেখার একটি অংশকে কবিতার মতো ছোটো-বড়ো অসমান লাইনে সাজিয়ে নিয়ে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের কোনো কোনো অংশ কবিতারই তুল্য। হয়তো কবিতার স্বাদ আনতে গিয়ে তার একটা-দুটো শব্দের ইতরবিশেষ করতে হয় কখনো কখনো, তাঁর নির্বাচিত অংশটিতে যেমনভাবে করে নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। কেননা তাঁর মনে হয়েছিল, কবিতা হিসেবে পড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলে ওই বদলটুকু দরকার, সম্পাদকীয় সেই বদল ছিল তাঁর 'শ্রবণের পথে অধিক প্রীতিকর'। কিন্তু ওরকম কিছু না করেও, অনেক সময়েই এমন ঘটতে পারে যে কোনো কোনো উচ্চারণের বা কোনো কোনো অভিজ্ঞতার সামনে এসে আমরা বলে উঠি এ যেন একেবারে কবিতার মতো। দেলাক্রোয়ার জার্নাল প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্পেন্ডারের মনে হয়েছিল যে সেখানে এমন অনেক টুকরো আছে যা 'makes writers envious' আর তেমন একটি টুকরো উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন তিনি 'The last line seems pure poetry'।

এই যে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে বুদ্ধদেব বা দেলাক্রোয়ার গদ্যে স্পেন্ডার বিশুদ্ধ কবিতার স্বাদ পেয়ে যাচ্ছেন, সেটা ঘটছে কীভাবে? এসব গদ্যকেই কেন তাঁদের মনে হচ্ছে কবিতাতুল্য? এ-প্রশ্নের কোনো যে সরল উত্তর আছে তা নয়। ঠিক-ঠিক শব্দের সন্নিবেশে একটা স্পন্দন তৈরি হয়ে ওঠা কিংবা একটা ছবির আবেশ তৈরি হয়ে ওঠা ছাড়াও আরো কোনো অনুভব হয়তো কাজ করে এখানে। সে-অনুভবে আমাদের অন্তর্লীন সত্তা হয়তো-বা মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে, যতটুকু বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি কোনো ইশারা যেন পাওয়া যায় সেখানে, আর তখন সেই মুহূর্তটাই হয়তো হয়ে ওঠে কবিতার মুহূর্ত, কবিতা-আস্বাদনের মুহূর্ত।

তবে অবনীন্দ্রনাথের বেলায়, গদ্য থেকেই যে বুদ্ধদেবকে এমন মুহূর্ত আবিষ্কার করে নিতে হচ্ছিল, তার হয়তো দরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতো না তাঁর গদ্যকবিতাগুলির কথা মনে রাখলে। পঞ্চাশ বছর আগেও অনেকেই লক্ষ করতে পারেননি যে আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে, ১৯২৭ সালে, সাময়িক পত্রিকায় বেশ কয়েকটি গদ্যকবিতাই লিখতে শুরু করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, পত্রিকায় যার পরিচয় দেওয়া হচ্ছিল 'শব্দচিত্র' নামে। তার মানে তো এই যে, অবনীন্দ্রনাথ ষাট বছর বয়সে পৌঁছবার অল্প আগে, তাঁর শিল্পীজীবনের পরমপ্রতিষ্ঠিত মুহূর্তে, হঠাৎ কিছু কবিতা লিখতেও চেয়েছিলেন? কিন্তু কেন তা চেয়েছিলেন?

শুধু কবিতা নয়, রং-তুলির জগৎ থেকে বেশ-কিছুদিনের মতো নিজেকে সরিয়ে নিয়ে শব্দেরই জগৎ নিয়ে মেতেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, তিরিশের দশকের কিছুকাল জুড়ে। কেন এমন করছেন, ছবি কেন আঁকছেন না আর, সে-প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে একবার বলেছিলেন তিনি 'ডিফিকালটি ওভারকাম করবার যে একটা আনন্দ' আছে, ছবি এঁকে সেটা আর তিনি পাচ্ছেন না তখন। উত্তরটা অবশ্য বিস্মিত করে আমাদের। যে কোনো শিল্পরূপের চর্চায় একথা কি কখনোই বলা যায় যে সমস্ত 'ডিফিকালটি'কে ওভারকাম করা গেছে? নতুন নতুন বাধার দরজা, নতুন নতুন পরীক্ষার দরজা শিল্পী নিজেই তৈরি করে নেন, আর তারপর খুলতে চান তাকে। এইরকমই তো হওয়ার কথা। বরং অন্য একটা সময়ে যেকথা বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, সেটা হয়তো আরেকটু বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুধাবনযোগ্য। বলেছিলেন, 'শিল্পী যে, সে শুধু ছবিই আঁকবে কেন?' প্রবল সৃষ্টিশীলতা অনেক সময়ে একইসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চাইতে পারে। যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথ একবার (১৮৯৩) লঘুভাবে লিখেছিলেন, 'muse' -দের মধ্যে কোনওটাকেই তিনি নিরাশ করতে চান না, সবকিছুরই চর্চা করতে ইচ্ছে করে, এমনকী ছবিরও। সে-ইচ্ছেকে অবশ্য বহুকাল পরে চরিতার্থ করে তুলেছিলেন তিনি, এঁকে ফেলেছিলেন দু-হাজারেরও বেশি ছবি, 'volcanic erruption' বলে যার বর্ণনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

তাহলে এইভাবে, কবিতা লেখার বাইরেও যেতে চান কবি, শিল্পরচনার বাইরেও যেতে চান শিল্পী। পৃথিবীজোড়া শিল্পসাহিত্যের ইতিহাসে এমন যাওয়া-আসার অনেক উদাহরণ পড়ে আছে আমাদের চোখের সামনে। পড়ে আছে এমনও উদাহরণ যে, কবিতাকে অনেক সময়ে ছবির ভাষা দিয়ে দেখতে চান কবি বা ছবিকে অনেক সময়ে শব্দের উপমায় ভাবতে চান একজন শিল্পী। ভ্যান গগ্ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে কখনো কখনো তাঁর ছবিতে 'the strokes come with a sequence and coherence like words in a speech'।

২

১৯৮৩ সালে ডিসেম্বরে, ভোপালের ভারত ভবনে, কয়েক সপ্তাহের জন্য একত্র হয়েছিলেন কয়েকজন সৃষ্টিশীল মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের নানা অঞ্চল থেকে আমন্ত্রিত তাঁরা কেউ ছিলেন চিত্রী, কেউ-বা কবি, সংগীতশিল্পী কেউ-বা। এক শিল্পরূপের সঙ্গে অন্য শিল্পরূপের পারস্পরিক সংলাপের পথ হিসেবে খুবই আদর্শ একটা আয়োজন ছিল সেটা। সেখানে একদিন, ক্লাসিক্যাল সংগীতের এক অনুষ্ঠানশেষে, সভামণ্ডপের বাইরে খোলা আকাশের নীচে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী স্বামীনাথন। অল্প পরে, প্রায় স্বগতকথনের মতো, অভিভূত স্বরে বলেছিলেন তিনি 'এত ছবি এঁকেও কি ওই সুরের কণামাত্র ছুঁতে পারি আমরা? গান যেখানে পৌঁছে দেয়, তার থেকে কতদূরেই-না পড়ে থাকে আমাদের ছবি! কী হবে আর এঁকে?'

শেষ কথাটার মানে নিশ্চয় এ নয় যে আঁকা তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন, পরের দিনই নতুন একটা ছবির সূচনা করেছিলেন স্বামীনাথন। আমরা শুধু লক্ষ করতে চাই অতৃপ্তির এই বোধটা—নিজের কাজ নিয়ে অতৃপ্তি। অবনীন্দ্রনাথের বলা কথাটার এ একেবারে বিপরীত, এ হল ডিফিকালটি ওভারকাম করতে না পারার বেদনা। স্বামীনাথন নিশ্চয় জানতেন লেওনার্দো দা ভিঞ্চির এই হিসেব যে সংগীতের জায়গা কখনোই ছবির আগে নয়, ছবির পরে সেটা। 'Music may be called the sister of painting, for she is dependent upon hearing, the sense which comes second' লিখেছিলেন তিনি। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে চোখের স্থাপনাই আগে, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগীতের চেয়ে বড়ো ছবি, এইরকম মনে হয়েছিল তাঁর। আর কবিতা? কবি? '...the poet ranks far below the painter in the representation of visible things, and far below the musician in that of invisible things!' কিন্তু প্রশ্নটা আগে-পরে নয়, উঁচু-নিচুর নয়। সব শিল্পই নিজের জগতে স্বরাট্। চিত্রশিল্পীও visible-এর মধ্যে invisible কে ধরবার আকুলতা বোধ করেন, যেমন সেদিন করছিলেন স্বামীনাথন। আবার সংগীতশিল্পীও invisible কে করে তুলতে চান visible, রাগের মধ্যে রূপ দেখতে পান তাঁরা। কবিতাও ধরতে চায় দুটোকেই, একই মুঠোয়। কবিতায় ভাষার যে সীমা, তাকে শব্দপ্রবাহের একটা সুর দিয়ে ছন্দ দিয়ে মুক্ত করে দিতে চান কবি 'ভাবের স্বাধীনলোকে,' একটি কবিতায় (''ভাষা ও ছন্দ'') যেমন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুত, সব শিল্পেরই আছে পরম সত্যকে স্পর্শ করতে চাইবার নিজস্ব নানা পথ, প্রভেদ পদ্ধতিতে। সেই প্রভেদের কথা মনে থাকে বলেই সব শিল্পই খানিকটা আড়চোখে তাকাতে চায় অন্য শিল্পের দিকে। যে-অধরাকে আমি প্রকাশ করতে চাই, যথেষ্ট তার প্রকাশ হচ্ছে না ভেবে হঠাৎ অন্য কোনো প্রকাশপথকে সাময়িকভাবে পরখ করে দেখতে চান কেউ। তার মানে এ নয় যে নিজের শিল্পরূপের চর্চাকে ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি, তার মানে শুধু এই যে কৌতূহলে তিনি দেখে নিচ্ছেন আরো এক রূপের মধ্যে আরো এক মনের প্রকাশ ঘটে কিনা। আর সে-কৌতূহলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়কর ফল হিসেবে কখনো কখনো আমাদের সামনে পৌঁছে যান ব্লেকের মতো বা রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো শিল্পী, মাইকেলেঞ্জেলোর মতো কোনো কবি!

৩

লেওনার্দো দা ভিঞ্চিকে যে শিল্পের স্থানাঙ্ক নিয়ে ভাবতে হয়েছিল, চিত্রশিল্পীকে যে সবসময় উঁচু জায়গা দিতে চেয়েছিলেন তিনি, তার হয়তো একটা সমকালীন কারণ ছিল। প্রাচীনকালে এই একটা কথার প্রচলন ছিল যে 'Painting is dumb poetry'। ছবি-আঁকার শিল্প একটা 'mechanical art' কিংবা সে বোবা কবিতা, এইসব কথার উত্তর হিসেবে বেশ রাগ করেই তাঁকে বলতে হচ্ছিল যে 'If you call painting dumb poetry, then painter may call poetry blind painting'

কিন্তু প্রচলিত কথাটার অর্ধাংশটাই বলছেন লেওনার্দো, পুরো কথাটা তো এই যে 'Painting is dumb poetry, and poetry speaking painting' । নেতির দিক থেকে না ভেবে এ-বর্ণনাকে হয়তো ইতিবাচক বলেও ভাবা যায়, ভাবা যায় কবিতা আর ছবির পারস্পরিক নিগূঢ় এক সম্পর্ক হিসেবেই। একটি কবিতা পড়বার পর যে অনির্বাচ্য অনুভব হয় অনেকসময়ে, তেমন একটা অনুভব হতে পারে একটা ছবির সামনে দাঁড়ালেও। এক নয় তাদের বিষয়, এক নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের উপকরণ, এক নয় তাদের পদ্ধতি। কিন্তু তবু যখন সমতুল্য কোনো অনুভবে পৌঁছে দেয় দুই শিল্প, তখন একথা বললে দোষের হয় না যে কবিতাতেও আছে ছবি, তবে সে-ছবি কথা বলে; ছবিতেও আছে কবিতা, তবে সে-কবিতা নীরব। 'বোবা' শব্দটা না বলে 'নীরব' বললে হয়তো সমস্যাটা মিটে যায়, তখন হয়তো দুই শিল্পকে একটা অন্তঃসম্পর্কের দিকে টানতে পারি আমরা। ছবি আর কবিতার (বা সংগীতের) প্রভেদসূত্রে আরো একটা কথা অবশ্য বলেছিলেন লিওনার্দো। বলেছিলেন 'Both verse and voice proceed through time in rhythmical formation. The painter does not express himself in rhythmical divisions of time but he may infuse rhythm into the contours of his figures'। ছবির প্রসঙ্গে 'space' শব্দটির ব্যবহার হল না এখানে, কিন্তু এই সূত্রটিরই বিস্তারে time এবং space এর স্বাতন্ত্র্য দিয়েই—এই দুই শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত কথা বলেছিলেন লেসিং। আর লেসিং থেকে—কিংবা আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে ম্যাথু আর্নল্ডের 'Epilogue to Lessing's Laocoon' কবিতা থেকে—ইঙ্গিত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রভেদের বিবরণ দেন এইভাবে যে ছবিতে বা সংগীতে 'এক মুহূর্তের বাহ্য অবস্থা প্রকাশ করা যায় মাত্র। যে মুহূর্তে একটি সুন্দর মুখে হাসি দেখা দিয়াছে সেই মুহূর্তটি মাত্র চিত্রে প্রকাশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়াছে, তাহার পরমুহূর্তটি আর তাহাতে নাই।' কিন্তু কবিতায়? কবিতার কাজ আরো ছড়ানো। যিনি কবি, ভাব থেকে ভাবান্তরে চলতে হয় তাঁকে। 'গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।' কবি যে এটা করতে পারেন তার কারণ তাঁর অবলম্বন সময়। শিল্পীর সঙ্গে তাঁর প্রভেদ—লেসিং-এর বর্ণনায়—'the one using forms and colours in sapce, the other articulates sounds in time'।

ছবিতে গোটা জমিনটাকে আমরা এক লহমায় দেখে নিতে পারছি। আর কবিতায় তার উন্মোচন চলছে অল্পে অল্পে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্তরে স্তরে। এই প্রভেদটাকে মনে রেখেও এক চরিত্র অন্যের ওপর প্রয়োগ করতে পারেন কোনো কবি বা শিল্পী। অনেকখানি সময়কে একত্রে ধরবার অন্যতম উদাহরণ হিসেবে লেসিং বলেছিলেন টিশিয়ানের একটি ছবির নাম Prodigal Son, যেখানে অতীত-বর্তমানের পুরো গল্পটার আদল রয়ে গেছে। কিন্তু, একে তার মনে হয়েছে একটা 'encroachment'। আমরা তা নাও ভাবতে পারি। আমরা ভাবতেই পারি যে আধুনিক ছবিতে সময়েরও ব্যবহার চলছে গূঢ়ভাবে। ছবিতে সময়ের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে দিতে পারে একটা অ্যাবস্ট্রাকশন। ছবির মধ্যেও সময়ের গতিকে হয়তো বা একভাবে ধরা যায়, যেমন space-কে ধরা যায় কবিতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর, এইভাবে এ-দুয়ের মধ্যে যাওয়া-আসার বা পরস্পর সম্পৃক্ততার সুযোগ আছে বলেই, বা সুযোগ করে নিতে চায় বলেই, এত হাত-ধরাধরি করে চলতে চায় ছবির আন্দোলন আর কবিতার আন্দোলন। এত যে আন্দোলনের কথা বলি আমরা--- Impressionsim, Dadaism, Surrealism— সে কি শিল্পের আন্দোলন না কবিতার? স্বতন্ত্রভাবে কারোই নয়, সংযুক্তভাবে দুয়েরই। দেলাক্রোয়া বিষয়ে লিখতে গিয়ে বোদলেয়র একবার বলেছিলেন যে, আমাদের যুগধর্ম হল এই : শিল্পমাধ্যমগুলি পরস্পরকে নতুন শক্তি দিতে চায় এখন। সেইজন্যেই এ আমাদের খুব স্বাভাবিকই লাগে যে মালার্মে প্রায় রোজই যাবেন দেগার স্টুডিয়োয়, লোরকার নিকটবন্ধু হবেন সালভাদোর দালি আর সেজানের ছবির বিষয়ে কেবলই লিখে যাবেন রিল্‌কে। কলকাতার পরিবেশে আমরা দেখেছি কীভাবে যামিনী রায়ের সঙ্গে লগ্ন থাকেন বিষ্ণু দে, বিষ্ণু দে-কে 'ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড' বলে ভাবেন 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর শিল্পীরা, ষাটের দশকের মধ্যভাগে নিজেদের মধ্যে কীভাবে নিত্যমেলামেশার একটা পরিসর তৈরি করতে চান তরুণ কবি আর তরুণ শিল্পীরা। আর এতসবের ফলে, পরস্পরকে আরো ভালোভাবে বুঝবার চেষ্টা করা ছাড়াও, কখনো কখনো হয়তো দেখা যায় শ'খানেক ছবি এঁকে বসছেন কবি বিষ্ণু দে, বা ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত লিখে বসছেন বেশ কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা, যার মধ্যে শুনতে পাই—বা দেখতে পাই— 'Those Iconic eyes of Byzantine sadness'! বোদলেয়র যাকে যুগধর্ম বলেছিলেন, এক হিসেবে তখন সম্পন্ন হয়ে ওঠে সেটা।

২০০৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তম্ভিত ইতিহাস নজরুল

নিজেকে 'স্বেচ্ছাচারী' বলে ঘোষণা করেছিলেন আমাদের কোন্ কবি? বাংলা কবিতা পড়তে যাঁরা অভ্যস্ত, এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁদের কোনো দ্বিধা হবার কথা নয়, তাঁরা নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গেই মনে করতে পারবেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম, তাঁর 'আমি স্বেচ্ছাচারী' লাইনটি, বা বিভিন্ন কবিসভায় প্রায় শারীরিক উৎক্ষেপের মধ্যে এই লাইনটি নিয়ে তাঁর নানা ভঙ্গিমার উচ্চারণ। ঠিকই, শব্দটির সঙ্গে শক্তির নাম জড়িয়ে আছে অনেকদিন; কিন্তু তবু বলা যায় তাঁরও আগে বাংলা কবিতার আরো একজন মানুষ ওই একই পরিচয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন নিজেকে, নিজের বিষয়ে বলেছিলেন 'স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা'।

উদ্ধৃতিচিহ্নের অন্তর্গত ওই শব্দগুলি অবশ্য কোনো কবিতার শব্দ নয়, এ হলো 'বাঁধনহারা' নামে নজরুলের উপন্যাস থেকে নেওয়া এক শব্দগুচ্ছ। সেই উপন্যাসে, কাউকে না বলে ঘর ছেড়ে সেনাদলে পালিয়ে গেছে যে নায়ক, সেই 'নূরু' একবার তার চিঠি শেষ করেছিল এই আত্মপরিচয়য় দিয়ে 'স্বেচ্ছাচারী—নূরুল হুদা'। এক-এক চিঠিতে তার আত্মপরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক-একরকম। কখনো সে লেখে 'তোমার কাঠখোট্টা লড়ুয়ে দোস্ত্', কখনো 'হতভাগা', কখনো-বা 'নরপিশাচ'। কিন্তু 'স্বেচ্ছাচারী' কথাটার দিকে লেখকের অতিরিক্ত ঝোঁক টের পাওয়া যায় যখন নূরুর প্রতি স্নেহশীলা এক ব্রাহ্ম মহিলা তাঁর 'পাগল পথিক' ওই 'ভাই'য়ের কথা বলতে গিয়ে তাঁরও চিঠিতে লেখেন : 'স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা সে— অতএব এখন রক্তের তেজে আর গরমে সে কত আরো অসম্ভব সৃষ্টিছাড়া কথাই বলবে!'

উপন্যাসেরই কথা যদি এসব, তাহলে কেন লিখছি নজরুল নিজেকে বলতে চেয়েছিলেন 'স্বেচ্ছাচারী'? এ তো তাঁর নিজের কথা নয়, এ তো তাঁর তৈরি এক চরিত্রের কথা মাত্র।

চরিত্রেরই কথা; কিন্তু এইখানেই এক সমস্যা তৈরি হয়। কবিরা যখন উপন্যাস লেখেন তখন প্রায়ই তাঁরা—অন্তত তাঁদের প্রথম দু-একটি লেখায়—অনিবার্যভাবেই প্রকাশ করে বসেন নিজেকে, যেমন করেছেন শক্তি অথবা জয়। তখন, সেটা হয়ে দাঁড়ায় যেন তাঁদের আত্মসত্তার কোনো ছদ্মপ্রকাশ। যে-নূরু নামে নজরুল ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন অনেকের কাছে, তাঁর গল্পে-উপন্যাসে প্রায়ই নায়ক হয়ে ওঠে সেই নামটি, প্রায়ই আমাদের খুব জানা নজরুল-লক্ষণগুলি আরোপিত হতে থাকে সেই নামের চরিত্রে। 'বাঁধনহারা' যখন ছাপা হতে শুরু করেছিল 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়, নজরুলের একুশ বছর বয়সে (বই বেরোয় আরো সাত বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে), তখনই হয়তো সকলের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না লেখকের সঙ্গে নূরুর একাত্মতার পরিমাণ। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই পাঠকেরা নিশ্চয় বুঝতে পারছিলেন, করাচি সেনানিবাসের ঠিকানা থেকে চিঠি লিখে চলেছে ঘরছাড়া যে বাঙালি যুবাটি, সে তো প্রায় নজরুলেরই প্রতিচ্ছবি। তার নিজের আর তার পরিচিত নানাজনের চিঠিপত্র থেকে নূরুর যে ব্যক্তিছবিটা জেগে উঠতে থাকে সে হলো এক কবির ছবি, এক গাইয়ের ছবি, রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় যার আনন্দ, সেই কবিতাগান শুনলে যার মনে হয় 'কে সে কবিশ্রেষ্ঠ যাঁর দুটি কালির আঁচড়ে এমন ক'রে বিশ্বের বুকের সুষুপ্ত ব্যথা চেতনা পেয়ে ওঠে? ...তাঁর চরণারবিন্দে কোটি কোটি নমস্কার!' আমাদের নিশ্চয় মনে পড়বে 'সঞ্চিতা'র উৎসর্গপাতা, ওই 'চরণারবিন্দেষু' লিখেই রবীন্দ্রনাথের কাছে যা পৌঁছে দিয়েছিলেন নজরুল। নূরুর বন্ধুরা তাকে বলে 'কবি-কিশলয়'; তার ভাবী বলেন, তার 'সরল অট্টহাস্যে'র কথা, গল্পের রহস্যালাপে ফাঁকা ঘরকে 'মজলিসের মত সরগরম করে' তুলবার কথা, 'প্রাণের অনাবিল সরলতা আর প্রচ্ছন্ন বেদনা'র কথা। তার চরিত্রে আছে 'ছায়ানটের নৃত্যচপলতা আর শিরায় শিরায় পূর্ণ তেজে নটনারায়ণ রাগের ছন্দপতন হিন্দোল দোল'। তাকে যারা ভালোবাসে তারা জানে 'স্রষ্টার বিদ্রোহী' এসব মানুষকে 'স্রষ্টার রাজভক্ত'দের চিনতে পারবার কথা নয়, তারা জানে যে 'সহজ ঐ ক্ষ্যাপাটাকে' ভালোবাসা যায়। নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্বেচ্ছাচারী' অভিধা দিয়ে নূরু বলে তার বন্ধুকে 'আগুন, ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, আঘাত, বেদনা—এই অষ্টধাতু দিয়ে আমার জীবন তৈরি হয়ে যা হবে দুর্ভেদ্য—মৃত্যুঞ্জয়—অবিনাশী! আমার এ পথ শাশ্বত সত্যের পথ; —বিশ্বমানবের জনম জনম ধরে চাওয়ার পথ। আমি আমার আমিত্বকে এ পথ থেকে মুখ ফিরাতে দেবো না।' কিন্তু এরই সঙ্গে, নিজেকে 'নরপিশাচ' নাম দিয়ে তার ভাবীসাহেবকে সে লেখে : 'মানুষের এতটুকু দুঃখ দেখে সময় সময় আমার সারা বুক সাহারার মত হা-হা করে আর্তনাদ করে ওঠে।' সে বুঝতে পারে না, অন্য কেউ বুঝবে বলেও মনে করে না যে 'হৃদয়ের এই যে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত দুষ্মনীভাব, এর সূত্র কোথায়', সে বুঝতে পারে না 'কি আমায় মাতাল করে তুলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে কোন অনন্ত যুগের অফুরন্ত কান্না কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠছে বিষের মত—তীব্র হলাহলের মত!'

'বিদ্রোহী' কবিতা লেখা হয়নি তখনও, কিন্তু 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য'র নজরুল নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করেছেন তাঁর এই চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে, বলতে শুরু করেছেন 'নূরুটা ক্রমেই স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে দেখচি...যেন একটা বিপুল ঘূর্ণীবায়ু হু-হু-হু-হু ক'রে ধুলো উড়িয়ে সারা দুনিয়াটাকে আঁধার ক'রে তুলতে চাইছে', আবার সেই নূরুই 'কোথায় কোন গহনপারের বাঁশী যেন...শুনছে আর শুনছে! যখন সবাই শোনে মিলনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দরাগ, এরা তখন শোনে বিদায়বাঁশির করুণ গুঞ্জরণ! ...এ ক্ষ্যাপার কোনটা যে অনন্দ কোনটা যে ব্যথা তাই যে চেনা দায়!'

২

ব্যথায় আনন্দে জড়ানো, বিদ্রোহে ভালোবাসায় জড়ানো সেই নজরুল ইসলামকে আমরা জানতে শুরু করেছিলাম আমাদের কৈশোর থেকে, প্রায় সকলেই যেভাবে জানে। কিংবা হয়তো ভুল হলো বলা। নজরুল ইসলামকে নয়, আমরা জানতে শুরু করেছিলাম তাঁর আবেগকে, ব্যক্তিপরিচয়হীন আবেগকে। আমার মতো অনেকেই হয়তো আছেন যাঁরা নজরুলের লেখা গান শুনেছেন---শুনে আচ্ছন্ন বা আলোড়িত হয়েছেন—নজরুলের নাম শুনবারও আগে। প্রায় যেন এক লোকসাহিত্য-লক্ষণ লিপ্ত হয়ে আছে তাঁর লেখায়, লেখাটা যেখানে সকলের, তার ব্যক্তিচিহ্নটা যেখানে গৌণ হয়ে যায়।

আমরা ছিলাম পদ্মাপারে, আট-নবছর বয়স তখন, কাকার বাড়িতে পৌঁছল ঝকঝকে একটা গ্রামোফোন। মফস্বল শহরে সেই ১৯৪০-৪১ সালে সে ছিল একটা ঘটনা, 'কাল মধুমাস' কবিতায় তারও আগেকার তেমনি এক ঘটনার চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নতুন কল এল, সেই সঙ্গে এল সদ্যপ্রকাশিত কিংবা অদূর-অতীতে প্রকাশিত রেকর্ডের সম্ভার, গানে-নাটকে রীতিমতো মথিত হয়ে উঠল সময়টা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, শচীন দেববর্মণদের সঙ্গে সঙ্গে নির্মলেন্দু লাহিড়ীও তখন অবশ্যসংগ্রহযোগ্য উপাদান, রেকর্ড থাকবে আর 'সিরাজদ্দৌলা' থাকবে না এ যেন তখন ভাবাই শক্ত। শচীনদেবের গান নিয়ে মশগুল সবাই, সেসব গানের কথা সুরকে প্রগাঢ়ভাবে বুঝে নেবার তখনও বয়স হয়নি আমাদের, কিন্তু তবু আমাদের মাতিয়ে রাখে 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে', 'কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া', 'মেঘলা নিশিভোরে' কিংবা 'পদ্মার ঢেউ রে'। পদ্মা তো আমাদেরই নদী, এ তো তবে আমাদেরই গান, আর ওসব পাখিও তো আমাদের পাখি! 'ওরে বনপাপিয়া, ছিলি কাহার পিয়া, ছিলি আর জনমে/আজও ভুলতে নারিস আজও দূরে গিয়া'—এর ভিতরকার বিরহবাগ ঠিকমতো তখন পৌঁছবার কথা নয় আমাদের মনে, কিন্তু তবুও, সেই কৈশোরে 'ওরে হারায় তাহার কী পাওয়া যায় না কি রে' কথাগুলি মনের ভিতর অস্পষ্ট একটা ব্যথাবোধই তৈরি করে তুলত বলে মনে হয়।

কিন্তু এসব তো শচীনদেবের গান। এর সঙ্গে নজরুলের কোনো সম্পর্কের কথা আমরা ভাবিনি তখন। 'সিরাজদ্দৌলা'য় 'আমি আলোর শিখা' বা 'পথহারা পাখি'কে জানতাম কেবল আলেয়ার গান কিংবা বড়োজোর নীহারবালার গান (কল্পতরু সেনগুপ্ত-র সংকলনে অনবধানে যাঁকে বলা হয়েছে কাননবালা) হিসেবে, তার মধ্যে কোনো নজরুলচিহ্ন তখনও টের পাইনি আমরা। দশ বছর বয়সে দেখা হলো ইস্কুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেদের একটা অভিনয়, সে অভিনয়ের অন্য কোনো নাট্যচিহ্ন আর মনে নেই আজ, কিন্তু মনে আছে ব্যান্ড বাজানোর তালে তালে মাতিয়ে দেওয়া এক 'মার্চিং সং' 'ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল'। আজও এ-গান শুনবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই অপটু-হাতে-বাঁধা-মঞ্চের উপর ব্যান্ডবাজানো কয়েকজন উঁচুক্লাসের বন্ধুর মুখচ্ছবি, দেখতে পাই তাদের পদক্ষেপ আর হাতের সঞ্চালন। তখনও জানিনি, জানতে চাইনি, ও-লেখা কার। জানতে চেয়েছি আরো দু-বছর পরে। গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী এসে আমাদের বৈঠকখানায় একদিন তাঁর ভরাট স্বরে বিপুল উৎসাহে গাইছিলেন কিছু দেশাত্মবোধের গান, সমবেত শ্রোতাদের পিছনে বসে হঠাৎ তখন একটা গানের কথাগুলি আমার লিখে নেবার আগ্রহ হলো। কাগজপেন্সিল জুটিয়ে নিয়ে দ্রুত হাতে লিখতে শুরু করলাম কথাগুলি, গান শুনে শুনে, কেননা কথাগুলি খুব পছন্দ হচ্ছে আমার। সভা সাঙ্গ হয়ে যাবার পর, পরে একদিন, একজন মাস্টারমশাইয়ের কাছে অজানা-এক গানের এমন আহরণের কথা বলছি যখন সগর্বে, মাস্টারমশাই বললেন সে কী রে, অজানা কেন হবে! এ গান কার লেখা জানিস না? এ তো নজরুলের গান!

গানটি ছিল জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাতজালিয়াত খেলছে জুয়া!

মাস্টারমশাই বললেন শুনিসনি 'কারার ঐ লৌহকপাট/ ভেঙে ফেল্ কর্ রে লোপাট'? শুনিসনি 'আমি বিদ্রোহী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রণক্লান্ত'? সেইদিন থেকে নজরুল ইসলাম এলেন আমার সচেতনতার মধ্যে। সেইদিন থেকে নজরুলের গানের সঙ্গে কথার সঙ্গে কবিতার সঙ্গে দেখতে শুরু করলাম একজন কবি-নজরুল, একজন ব্যক্তি-নজরুল। সে-নজরুল পাখিদের ডাকে বিরহের চিহ্ন দেখেন, পদ্মার স্রোতে হারানোর ব্যথা দেখেন, বাহিরে-অন্তরে ঝড় উঠলে সে-নজরুল আশ্রয়ের খোঁজ করেন, আবার একইসঙ্গে সে-নজরুল বলেন : 'মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়' কিংবা 'জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া'।

৩

'বাঁধনহারা'র নূরু, কিংবা তার অগ্রজাতুল্যা সেই ব্রাহ্ম নারী সাহসিকা, এদেরও একটা বড়ো অভিযান ওই জুয়ার বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের দেশের আর কোনো কবি বা নেতার কাছে যে-সমস্যা তখনও খুব প্রত্যক্ষ সংকট হিসেবে দেখা দেয়নি, সেই সম্প্রদায়সমস্যা 'বাঁধনহারা'র অন্তর্গত একটা দৃষ্টিভূমি তৈরি করে রেখেছিল বেশ স্পষ্টভাবেই, ১৯২০ সালেই, সাহিত্যভূমিতে নজরুলের পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। স্বেচ্ছাচারী বলে নিজেকে তিনি ঘোষণা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর স্বেচ্ছাচার এই সংস্কারের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছার জাগরণ। সূচনায় আমরা বলেছি, লেখাটির মধ্যে কীভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে নজরুলেরই চরিত্র। যা তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা হয়নি তা হলো, কী আছে সেই চরিত্রের—কিংবা, সে-বইয়ের চরিত্রাবলির— দৃষ্টিতে। কী তারা দেখছে, কী তাদের বলবার কথা। 'হ্যাঁ, ধর্ম সম্বন্ধে আমার আর একটু বলবার আছে। ...আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খৃষ্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম।' উপন্যাসে নূরুর কথা এ নয়, এ হলো সাহসিকা নামে চরিত্রটির মুখের কথা। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে বাংলাসাহিত্যজগতে পৌঁছবার মুহূর্তে এ হলো সাহসিকার সূত্র ধরে নজরুলেরই আত্মঘোষণা। এই ঘোষণার এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল সেদিন। এই ঘোষণায়, অথবা এ উপন্যাসের আরেক চরিত্র রাবেয়ার অভিজ্ঞতার বর্ণনায়, নজরুল যে-আবেগ প্রকাশ করেছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে প্রায় আশি বছর পরেও সে-আবেগ আমাদের কাছে জেগে থাকে সমসাময়িক বেদনা নিয়ে। বলতে হয় রাবেয়াকে, রাবেয়াদের 'এখনো দেশের পনর আনা হিন্দুর সামাজিকতা এইরকম আচারবিচারে ভরা। ...পাশাপাশি থেকে এই যে আমাদের মধ্যে এত বড় ব্যবধান, গরমিল্, এ কি কম দুঃখের কথা? আমাদের...অভিমান এতে দিন দিনই বেড়ে চলেছে। ...এই ছোঁয়াছুঁয়ির উপসর্গটি যদি কেউ হিন্দুসমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, তা হলেই হিন্দু মুসলমানের এক দিন মিল হয়ে যাবে। এইটেই সবচেয়ে মারাত্মক ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে, কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনাকাঙ্ক্ষী বড় বড় রথীরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা ধরতে পারে নি। ...দেশকালপাত্র ভেদে সমাজের সংস্কার হওয়া উচিত নয় কি?'

নজরুলের কথা আজ যখনই মনে পড়ে আমাদের, মনে পড়ে মিলনগত এই অসম্পূর্ণতার কথা। আর তখন মনে হয়, বাক্‌শক্তিহারা তাঁর অচেতন জীবনযাপন যেন আমাদের এই স্তম্ভিত ইতিহাসের এক নিবিড় প্রতীকচিহ্ন। যে-সময়ে থেমে গেল তাঁর গান, তাঁর কথা, তার অল্পকিছু আগেই তিনি গেয়েছিলেন 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না', কিংবা রবিহীন পৃথিবীর হতাশ্বাসের কথা দরাজ গলায় শুনিয়েছিলেন 'আমরা ভাগ্যহত'। অনেক সময়ে আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে গাওয়া বা বলা ওই তাঁর কথাগুলি যেন আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি তাঁকেই, যেন আমরাই ওগুলি বলছি নজরুলকে লক্ষ ক'রে, আমাদের ইতিহাসকে লক্ষ ক'রে।

১৯৯৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের না-লেখা

আমাদের জাতীয় সংগীতটি কি দেশাত্মবোধক গান, না কি নিছক সম্রাটবন্দনা? গোটা ভারত জুড়ে এমন একটা সংশয়ের কথা মাঝে মাঝেই জেগে ওঠে। শুধু লোকমুখে নয়, তীব্র প্রশ্নাকারে সে-সংশয় বারে বারেই উচ্চারিত হয় এমনকী লোকসভাতেও। এমন দাবিও কখনো কখনো ওঠে যে জাতীয় সংগীত হিসেবে পালটে দেওয়া হোক এ-গান, কেননা জনগণমনের অধিনায়ক হিসেবে সম্রাট পঞ্চম জর্জের জয়ধ্বনি তোলা সামগ্রিক একটা জাতীয় লজ্জা। আর সে-লজ্জা আরো শতগুণে বেড়ে যায় যখন তাকেই আমরা জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিই।

কথাটা উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই এবং বেদনার সঙ্গেই তাঁকে বলতে হয়েছিল 'পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথ পরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্য-রথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না', বুদ্ধিভ্রংশ না হলে সেটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে পুলিনবিহারী সেনের কাছে লেখা এই চিঠিটির কথা সকলেই এখন জানেন। জানেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুল এই ধারণা প্রশমনের জন্য ইংরেজিতে বা হিন্দিতে এ নিয়ে পুস্তিকা আছে প্রবোধচন্দ্র সেনের, আছে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের। তারও পরে গানটির এই একশোদুই বছরের ইতিহাসে এ নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ লেখালেখিও হয়েছে বিস্তর, তবুও প্রশ্নের বিরাম নেই। প্রশ্ন যাঁরা তুলবেন তাঁরা আরো অনেকদিন ধরেই তুলতে থাকবেন প্রশ্ন, তাঁদের জন্য উত্তরও মজুত থাকবে ওইসব লেখাপত্রে। আমাদের এই লেখাটি সেই সমস্যা নিয়ে নয়। এখানে আমরা কেবল লক্ষ করতে চাই সত্যি সত্যি পঞ্চম জর্জের জন্য নিবেদিত একটি বন্দনাকে। লক্ষ করতে চাই এইজন্য যে বন্দনার সেই ছবিটা—যে-কোনো কারণেই হোক—বহুজনজ্ঞাত বা বহুপ্রচারিত নয়।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বের পঁচিশ বছর হল ১৯৩৫ সালে। তাঁর দেশে যে এ নিয়ে কিছু সমারোহ হবে তা অনুমান করা যায়। কিন্তু কেবল তাঁর দেশেই নয়, তাঁর সাম্রাজ্যের অন্যত্রও দেখা গিয়েছিল বেশ ভরাট আবেগ। সেই আবেগের বশে, কলকাতার সংস্কৃতিজগতে সেকালীন বিশিষ্ট মানুষদের আগ্রহে, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় আর সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায়, প্রকাশিত হলো সম্রাটের জন্য একটি সংবর্ধনা-বই, ১৯৩৫ সালের জুন মাসে। '১১ খানা বহুবর্ণ, ৩ খানা দ্বিবর্ণ এবং ৪৯ খানা একবর্ণ আর্ট-প্লেট্ সম্বলিত' বড়ো আকারের দেড়শো পৃষ্ঠার এই বইটির প্রকাশক ছিলেন বেঙ্গল জার্নাল্স লিমিটেড (১৪ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা), মুদ্রাক প্রবাসী প্রেস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখ্যাপত্রে বড়ো বড়ো হরফে বইটির নাম লেখা রক্তাক্ষরে রজত-জয়ন্তী। আর তার নীচে, উপনাম হিসেবে কালো হরফে

ভারত সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর। গর্বোদ্ধত মলাট জুড়ে অশ্বারোহী পঞ্চম জর্জের বড়ো একখানা ছবি, এর পদতলে বইয়ের নাম-উপনাম (ওই একইরকম লাল-কালো হরফে) এবং ব্রিটিশ সিংহের প্রতীক চিহ্ন। বইয়ের সূচনায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বলা ছিল 'সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজত-জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য আমরা এমন একটি বই বাহির করিতেছি যাহা রেফারন্সে-বহি হিসাবে দীর্ঘদিন লোকের কাজে লাগিবে। সম্রাটের রাজত্বের বিগত পঁচিশ বৎসরে ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের...বহু বিভাগে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ তাহারই সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।'

কারা ছিলেন এই বিশেষজ্ঞরা? সাতাশজন লেখকের সে-তালিকায় নাম আছে জগদীশচন্দ্র বসু, যদুনাথ সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন, নির্মলকুমার বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশীর মতো কৃতবিদ্যা মানুষদের। দীর্ঘ সেই তালিকায় একজনের নাম নেই। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদকেরা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ জন (সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে তাঁর বিরোধের পর্বটা ততদিনে মিটে গেছে), লেখকদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকেই তাঁর বিশেষ কাছের মানুষ। তবু রবীন্দ্রনাথের লেখা কেন নেই? সম্পাদকেরা জানাচ্ছেন 'বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনা এই প্রবন্ধসংগ্রহে দিতে পারিলাম না।' কেন পারলাম না? কেননা 'শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই।'

রবীন্দ্রনাথের এই না-লিখতে পারার প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলবার আগে আমরা একবার দেখে নিই, লিখতে যাঁরা পেরেছিলেন তাঁরা কী বলছিলেন সেদিন। নিজের নিজের চিন্তাজগতের বা চর্চাজগতের চৌহদ্দিতে কতটা কাজ হয়েছে তারই একটা হিসেব দিয়েছেন সবাই, সম্পাদকদের অভীষ্ট 'রেফারেন্স-বহি' হিসেবে যা যথেষ্ট মূল্যবান। এই হিসেবটাকে অবশ্য তিনটে ভাগে সাজিয়ে নেওয়া সম্ভব। কেউ কেউ আছেন যাঁরা পঁচিশ বছরের হিসেবটাকে তেমন মানেননি, হয়তো বলেছেন একেবারে বৈদিক যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত বিবরণ (যেমন আমাদের সমাজে নারীর স্থান নিয়ে ক্ষিতিমোহন সেনের লেখা), কিংবা উনিশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত হিসেবে (যেমন অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতীয় চিত্রকলা বা চারুচন্দ্র দাশগুপ্তের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের কথা)। বেশির ভাগই অবশ্য পঁচিশ বছরের হিসেবটা মেনেছেন, কিন্তু সম্রাট-নিরপেক্ষ ভাবে (যেমন সংগীত নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ, মনোবিদ্যা নিয়ে সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, আমাদের কথাসাহিত্য বা কাব্যসাহিত্য নিয়ে প্রমথনাথ বিশী, বৃহত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত বিষয়ে দেবপ্রসাদ ঘোষ বা এইরকম আরো অনেক)। তবে বেশ কয়েকটি লেখাই আছে যেখানে পঁচিশ বছরের অগ্রগতির সঙ্গে সম্রাটের রাজত্বকালকে কার্যকারণসূত্রেই বেঁধে নেবার চেষ্টা আছে লেখকদের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে। আধুনিক ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন যে রজত-জয়ন্তীর 'এই শুভদিনে হিসাব করিয়া দেখা যাউক' বিভিন্ন দিকে আমরা কতটা এগিয়েছি, লিখেছেন 'সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালে' যেসব চিত্রকলার অনুশীলপ্রবণতা বেড়েছে তার কথা। পশুপতি ভট্টাচার্য বলেছেন 'আর কোনো রাজার আমলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়নি।' একেবারে বেন্টিঙ্কের ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৩৫) থেকে শুরু করে একশো বছর জুড়ে আমাদের শিক্ষার যে গরিমা, তার বিবরণ দিতে গিয়ে অনাথনাথ বসু লিখেছেন বর্তমান 'সম্রাটের প্রচারিত আদর্শের সাধনা'র কথা, সগৌরবে বলেছেন জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিপত্তনও 'জর্জীয় আমলে'। সুনীতিকুমার লিখেছেন 'সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর ''রজত-জয়ন্তী'' পর্যন্ত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় উচ্চতম কোটির কার্য্য হইয়াছে'; এমনকী যদুনাথ সরকারও বলবেন 'বর্তমান রাজার রাজত্বকালে আমাদের সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যের বিষয় এইটি যে আজ ভারত-ইতিহাসের প্রায় সমস্ত বিভাগেই বিশেষজ্ঞ শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ভারতেই বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতেছেন।' এইভাবে অনেকেরই লেখায় সম্পাদকদের এই আবেগের কিছুটা প্রতিফলন যেন ঘটে '...যখন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পুরাতন রাজ-মহিমা অস্তাচলগত অথবা অস্তাচল-চূড়াবলম্বী, ইংলন্ডের তখনও দ্বিপ্রহর।' কেন এখনও, এই ১৯৩৫ সালেও, সে-রাজমহিমার দ্বিপ্রহর।' 'ইহার জন্য অধিক দায়ী ইংলন্ডের স্থিতিশীল কন্‌ষ্টিটিউশন, অথবা সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের গতিশীল জীবন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।' সম্ভবত এই গতিশীল জীবনের কথা মনে রেখেই সম্রাটের বহুবিধ ছবির মধ্য থেকে মলাটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে তাঁর অশ্বারোহী ছবিটি!

সেই 'গতিশীল জীবন'-এর বা 'স্থিতিশীল কন্‌ষ্টিটিউশন'-এর বিষয়ে এসব আবেগ প্রকাশ করা হচ্ছে রাজমহিমার কোন্ দ্বিপ্রহরে? দেশের পটভূমি ঠিক কী রকমের, সেই ১৯৩৫ সালে?

আইন-অমান্য আন্দোলন আর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উত্তেজনা ঘটে গেছে এর ক-বছর আগে, তার জের ফুরোয়নি তখনও। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে আপাতত উত্তাল দেশ। ১৯৩৪ সালে ওই বাঁটোয়ারা নিয়ে পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভাপতিপদ ছেড়ে দিচ্ছেন মদনমোহন মালব্য সাতাশে জুলাই, আর সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ধায় নতুনভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করছে এ. আই. সি. সি.। গোটা বছর জুড়ে একের পর এক বিপ্লবী নিহত হচ্ছেন বাইরে পুলিশের গুলিতে কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারান্তরালের ফাঁসিতে, উল্টোদিকে বিপ্লবীরাও হত্যা করেছেন পুলিশকর্মী বা পুলিশের গুপ্তচরদের। ৭ জানুয়ারিতে হত বিপ্লবী নিত্যরঞ্জন সেন আর হিমাংশুবিমল চক্রবর্তী, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অপরাধে ১২ জানুয়ারি ফাঁসি হচ্ছে সূর্য সেন আর তারকেশ্বর দস্তিদারের। ১৪ মে বৈকুণ্ঠ সুকুলের, ৫ জুন কৃষ্ণকুমার চৌধুরী আর হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর, ৯ জুন দীনেশচন্দ্র মজুমদারের, ২ জুলাই অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্যের, ২৫ অক্টোবর ব্রজকিশোর চক্রবর্তী আর রামকৃষ্ণ রায়ের, ২৬ অক্টোবর নির্মলজীবন ঘোষের, ১৫ ডিসেম্বর মতিলাল মল্লিকের ফাঁসি। কখনো জেলবন্দী অবস্থায় মৃত্যু বা আত্মহত্যা—২০ জুন মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর, ২৭ আগস্ট ব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরীর, ১৯ ডিসেম্বর সান্ত্বনা গুহের। ১৯৩৫ সালের জুন মাসেই (৪ তারিখ) পুলিশ ইনফর্মার কালীপদ বিশ্বাসকে খুন করা হয় ফরিদপুরে, ১৫ জুন ইন্সপেক্টর অব পুলিশ এরশাদ আলীকে খুন করা হয় ফরিদপুরে, ১৫ জুন ইন্সপেক্টর অব পুলিশ এরশাদ আলীকে তাঁর অফিসের মধ্যেই ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করছেন একজন জেলবন্দী, রোহিণী বড়ুয়া।

এই হলো সাম্রাজ্যের সেই 'দ্বিপ্রহরের' ছোটো একটি রেখাচিত্র। এইরকম একটা পরিবেশের মধ্যে যখন 'রজত-জয়ন্তী' প্রকাশের আয়োজন চলছে, তখন রবীন্দ্রনাথ সেখানে কিছু লিখতে পারেননি না কি তাঁর অসুস্থতার জন্য। অন্তত সেইরকমই জানাচ্ছেন এর সম্পাদকেরা। ১৯৩৫ সালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো জ্বরাক্রান্ত হয়েছেন অবশ্য, কিন্তু বড়ো রকমের তেমন কোনো দুর্যোগের খবর পাওয়া যায় না। আর অল্পস্বল্প সেসব জ্বরজারির সময়েও তাঁর লেখার বা পর্যটনের কোনো বিরতিও দেখা যাচ্ছে না। এই কটা মাস কি কিছুই লেখেননি তিনি?

জানুয়ারি মাসের গোড়াতেই কলকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধনে তিনি পড়েন 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' নামের একটি প্রবন্ধ, নিখিলবঙ্গ সংগীত সম্মেলনেরও উদ্‌বোধন করেন তিনি। ৮ ফেব্রুয়ারি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন ফেব্রুয়ারির গোড়া থেকে, ৬ তারিখে শান্তিনিকেতন ছেড়ে রওনা হচ্ছেন কাশী এলাহাবাদ লাহোরের উদ্দেশে। ৯ তারিখে এলাহাবাদের মহিলাসভায় সংবর্ধনা নিচ্ছেন, ১১ তারিখে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন বেসান্ট স্কুলের বার্ষিক সভায়। ১২ তারিখে সিনেট-গৃহের আরেকটি বক্তৃতা এবং তার পর চলে যাচ্ছেন লাহোরে। সেখানে ১৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসভায় ভাষণ, ১৭ তারিখে আরো একটি বক্তৃতা, ১৯ তারিখে সংবর্ধনা গ্রহণ। এই লাহোরবাসের সময়েই খোশমেজাজে কিছু কবিতা লিখছেন, যার মধ্যে আছে 'আধুনিকা'র মতো মজাদার লেখাটি। আর সেইসঙ্গে ছবিও আঁকছেন অনেক। ২৭ ফেব্রুয়ারি লখনৌ-বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ে দুদিন বক্তৃতা। কলকাতা ফিরে আসছেন ৪ মার্চ, তার আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুস্থতা সত্ত্বেও গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চাঙ্গসংগীতের আসরে গান শোনা। ২১ মার্চ ধূর্জটিপ্রসাদকে সুদীর্ঘ চিঠি লিখছেন সেই গানের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিতর্কমূলক প্রশ্ন তুলে। তারও পরে সংগীতপ্রসঙ্গে তাঁকে এমন আরো কয়েকখানা চিঠি জুন মাসের আগেই ৩০ মার্চ ৯ এপ্রিল ১৫ মে ১৬ মে। অন্যদিকে, লাহোর থেকে হিন্দুমুসলমান-সম্পর্কের যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন, তার ভিত্তিতে ৭ মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে একটি পত্রপ্রবন্ধ লিখছেন দুঃসহ এই সমস্যা বিষয়ে, যেখানে আছে সাম্রাজ্যের দ্বিপ্রহর-ধারণার বিরুদ্ধ এই কথাও যে '...ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ষ খসে পড়বেই।'

ছ-মাস জোড়া এই বিচিত্র কার্যক্রম আর রচনাক্রমের মধ্য থেকে, শুধুমাত্র অসুস্থতার জন্য সম্রাট-বন্দনা-সংখ্যায় কিছু লিখতে পারলেন না তিনি, একথা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এমন অনুমান অসংগত নয় যে লিখতে চাননি বলেই লেখেননি তিনি। অসুস্থতার কথা যদি বলেও থাকেন, সেটা অজুহাত মাত্র। সে-অজুহাত হয় তাঁর, নয় তো সম্পাদকদের। ওই সময়কার নানা পর্যটন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটা মন্তব্য করেছিলেন '...দেহ না চলিলেও মন চলে, এবং মন চলিলে দেহকে যাইতেই হয়।' ঠিকই কথা, মন যদি চাইত, তবে 'রজত-জয়ন্তী'র জন্য একটা কোনো লেখা পাঠিয়ে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব হতো না একেবারে। কিন্তু চাননি তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই না-চাওয়াটাকে, এই না-লেখাটাকে কি খানিকটা গুরত্ব দিয়েই দেখা উচিত নয়? জাতীয়সংগীত যে সম্রাট-বন্দনার গান নয়, সে বিষয়ে যখন কথাবার্তা হয়, তখন এই সম্রাট-বন্দনায় যোগ না-দেওয়াটাকেও লক্ষ করা কি সংগত নয়?

পুলিনবিহারী সেনকে লেখা চিঠিটি এর দু-বছর পরের ঘটনা।

২০১৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংযোগের মানুষ শিশির

শিশির এসে পৌঁছবে দিল্লি থেকে, থাকবে কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে, মনটা ভরে আছে খুশিতে। খুশিতে ভরে আছে, কেননা এই কয়েকটা দিন কেটে যাবে শুধু রঙ্গমুখর কথাবার্তায়, কলকাতায় আমাদের ছোটো-একটা বন্ধুবৃত্তের প্রাণোচ্ছল গল্পগুজবে, অল্পবয়সীদের উন্মুখ যাওয়া-আসায়, আর সেইসঙ্গে নতুন আর সতেজ অনেক পরিকল্পনার আঁচে। শিশির এসেছে মানেই হলো কোনো-না কোনো সেমিনারের বা কনফারেন্সের জন্য নতুন কোনো প্রবন্ধ আছে সঙ্গে, কিংবা যাদবপুরের অল্পদিনের অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে উদ্দীপক কোনো ভাবনা আছে মনে, কিংবা হয়তো কোনো নির্বাচন-সমিতির সদস্য হিসেবে দুরূহ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তায় আছে সে। এই কয়েকটা দিনে সেইসব চিন্তা বা কল্পনার ছোঁয়া পাওয়া যাবে অনেকখানি, আমাদেরও নতুন খানিকটা শেখা হয়ে যাবে। শেখা হয়ে যাবে কীভাবে একটা আনন্দময়—এমনকী হুল্লোড়ভরা—দিনযাপনের মধ্যে দিয়েও আনাগোনা করা যায় চিন্তাভাবনার চর্চায়। আমাদের কারো কারো অভ্যস্ত শিথিলতায় কিছুটা শৃঙ্খলা দিয়ে, আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কোনো নিষ্ক্রিয়তায় খানিকটা উজ্জীবনের আভাস দিয়ে, ফিরে যাবে সে দিল্লিতে।

তার এই আসা আর কয়েক দিনের থাকা আমাদের নিয়মিত প্রত্যাশার অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে তার এই চলে আসা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটতে থাকবে। ঘটছিলও তা। বছরে কয়েকবার, কখনো-বা প্রতিমাসেই একবার তার দেখা পাওয়া যায় এই শহরে। তেমন ভাবেই দেখা পাওয়া গিয়েছিল এই কয়েক মাস আগেও, এই মার্চেও, এই এপ্রিলেও। কোনো-না-কোনো কারণে ডাক দিলেই তাকে পাওয়া যাবে এটা অনেকেরই বেশ জানা হয়ে গিয়েছিল। জানা হয়ে গিয়েছিল যে প্রথমে অল্প একটু আপত্তি করবে সে, শারীরিক কারণে ঈষৎ অনিচ্ছা জানাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তবু ছাড়তে পারবে না কলকাতার অরোধ্য টান। ছাত্রবয়স পেরিয়ে যাবার অল্প পরেই কাজের সুবাদে তাকে চলে যেতে হয়েছিল লন্ডনে, স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর অধ্যাপনায়। কিন্তু সেখান থেকে ফিরবার পর তার নিজের শহর কলকাতায় স্থায়ী বাসের আর সুযোগ ঘটে না কখনো। তাই অস্থায়ী এই অবস্থানগুলি তার কাছে হয়ে ওঠে অনেকখানি, এসব অবস্থানের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে সে পান করতে চায় অপার তৃষ্ণায় প্রায় কিশোরোচিত আবেগে। সাময়িক একটা তৃপ্তি নিয়ে (কিন্তু অনেকসময়েই চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোণে জলের আভাস নিয়ে) সে ফিরে যায় তার কর্মভূমি দিল্লিতে।

শরীরে যে একটা অসুখ জমা ছিল সেকথা সে গোপন করত না কখনোই, জ্ঞানত আমরা সকলেই জানতাম হৃদ্‌গত সেই অসুখের খবর। কিন্তু তার চলাফেরার সাবলীলতায় আমরা ভুলে থাকতাম সেই অসুস্থতার গুরুত্ব, দেশেবিদেশে অবিরত দৌড়ঝাঁপ থেকে তাকে বিরত করার কোনো চেষ্টাও করতাম না আমরা। কেননা এই দৌড়ঝাঁপে সে তো কেবলই আমাদের সাহিত্যের কথা আমাদের সংস্কৃতির কথা আমাদের ঐতিহ্যের কথা বলে বেড়াচ্ছে গোটা পৃথিবী জুড়ে। এক হিসেবে, সে যেন আমাদের সত্যিকারের এক সাংস্কৃতিক দূত হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে এদেশ-ওদেশ। নিজের জীবনের অবস্থানকে সে ঠাট্টা করে অনেক সময় বলত 'এ-টেল অব টু সিটিজ'; কিন্তু শুধু তো দিল্লি আর কলকাতার মতো দুই শহরের হাইফেন হয়েই নয়, শুধু তো সমগ্র ভারতের সঙ্গে বাংলার এক সেতুপথ হয়েই নয়, পৃথিবীর নানা অঞ্চলের সঙ্গেই ওই সেতুপথ সে তৈরি করতে চাইছিল তার দেশবিদেশের আনাগোনার মধ্য দিয়ে। তাই অসুস্থতার মধ্যেও দূর দেশে পাড়ি দিতে দেখলেও বিচলিত হতাম না আমরা, ভাবতাম তার প্রাণশক্তিতে সহজেই সে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে তার শারীরিক সব বাধা। ৭ মে রাত্রিবেলা তার আকস্মিক মৃত্যুর খবরে হতচকিত থাকবার খানিকক্ষণ পরে মনে পড়ে যায় যে এর জন্য তৈরি থাকাই আমাদের পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগত হতো, কেননা তার শারীরিক ক্ষয়ের কথা তো একেবারে অজানা ছিল না আমাদের। কিন্তু তৈরি থাকতে পারিনি আমরা; আমরা ভুলে ছিলাম তার কথার লাবণ্যে, ভুলে ছিলাম চারপাশের সঙ্গে তার চির-উৎসুক সম্পর্করচনার আগ্রহের তীব্রতায়।

সেই তীব্রতায়, এই মার্চেও, কলকাতায় কয়েক দিনের অবিরল ব্যস্ততার মধ্যেও সে সময় করে নেয় একবার শান্তিনিকেতন ঘুরে আসবার। কেননা কয়েকদিন আগে মৃত্যু হয়েছে তার অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর। এই অধ্যাপকের কাছে দু-বছরের জন্য পাঠ নিয়েছিল সে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, অনেকেই যেমন নেয়। কিন্তু অন্য অনেকের মতো সে ভুলে থাকেনি সেই সময়টাকে। সেই পাঠস্মৃতি কৃতজ্ঞ মনে সে বয়ে চলেছে আজীবন। যত কষ্টই হোক, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জানাবার জন্য সেই মানুষটির স্মরণ-কাজে একবার না পৌঁছলেই নয়। কিংবা সে মনে রেখেছে তার স্কুলশিক্ষক পরিমলবাবুর কথা, ভবানীপুর সাউথ সাবার্বন স্কুলের পরিমলকুমার দত্ত। এই শিক্ষকেরও মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে অব্যাহত যোগ রেখে যায় শিশির, কেননা মনে মনে তাঁকে আদর্শ করে নিয়েছিল সে, নিজের জীবনে গভীরভাবে অনুভব করেছে তাঁর প্রভাব। কিংবা কলকাতা এসে পৌঁছলেই তাঁর প্রথম কৃত্য ছিল রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া, তাঁর কুশল জেনে নেওয়া, কেননা তাঁরই স্নেহে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বাবধানে সে শুরু করেছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনার কাজ। সে কাজ তো কেবল অধ্যাপনারই নয়, প্রসারিত একটি কল্পনা দিয়ে কোনো একটা বিভাগকে নির্মাণ করে তোলাই ছিল সেই কাজ। ও-রকম বিভাগের কোনো পূর্বনির্ধারিত আদর্শ কোথাও নেই বলেই কাজটা ছিল দুরূহ। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সব সময়েই বলবেন যে এরকম একটা বিভাগের নির্মাণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে উঠত যদি না শিশির হতো তার প্রধান স্থপতি, আর শিশির অনেকসময়েই বলবে এ-কাজ করাই যেত না যদি রবীন্দ্রকুমার না থাকতেন এর প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্রকুমার সে-বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসবার পর কেটে গেছে পঁচিশ বছরেরও বেশি সময়, কিন্তু অচ্ছিন্ন থেকে গেছে পরস্পরনির্ভরতার আর পারস্পরিক শ্রদ্ধার সমুজ্জ্বল মমতাময় সংযোগ।

এইসব যোগ থেকে বোঝা যেত শিশিরের মানসিকতার বড়ো একটা দিক। প্রবহমানতার সঙ্গে, দেশীয় চরিত্রের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে রাখবার একটা প্রবণতায় ভরাট ছিল তার মন। সেই মন নিয়েই তার রচনার পরিচয় হিসেবে সে বলতে পারত বাংলা ভাষা নিয়ে তার 'অভিমান, উদ্‌বিগ্নতা ও আশা'র কথা। সেই মন নিয়েই হঠাৎ হঠাৎ সে প্রশ্ন করতে পারত আচ্ছা, এটা কি মনে হয় না যে আধুনিকতার একটা তক্‌মার দিকে বড়ো বেশি মন দিতে গিয়ে আমরা প্রায়ই অন্যায়ভাবে ভুলে থাকি এমন অনেক কবিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কিছু মনোযোগ যাঁদের প্রাপ্য ছিল, যাঁরা অনেকটা বেশি আমাদের মাটির সঙ্গে জড়ানো? এ-রকম প্রশ্নসূত্র থেকেই সে রবীন্দ্র-সমকালীন বা রবীন্দ্র-উত্তরকালীন অনেক কবির বিষয়ে লিখতে শুরু করে, ভিন্ন এক বিচারমান দিয়ে, আধুনিকতার গণ্ডিবদ্ধ একটা ধারণাকে একেবারে তুচ্ছ করে দিয়ে। সেই মন নিয়েই সে খুঁজতে থাকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা আর সাহিত্যগুলির অন্তর্বর্তী যোগ, খুঁজতে থাকে 'ভারতীয় সাহিত্য' কথাটার বাস্তবিক তাৎপর্য কোথায় বা কতখানি। স্বপ্নে কল্পনায় অস্থির মন নিয়ে সে স্থিরভাবে তৈরি করে নেয় এক ছক, চারপাশের বিদ্বজ্জনের একটা পরিমণ্ডল গড়ে নিয়ে ভেবে দেখতে চায় পথিকৃৎ এক বিরাট কাজের সম্ভাবনা, আট খণ্ডে সম্পূর্ণ কোনো এক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, যার শেষ খণ্ডটির দায় নেবে সে নিজেই। দুই পর্বে পূর্ণ সেই পরিব্যাপ্ত খণ্ডের—কার্যত যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অষ্টম আর নবম—প্রকাশ ঘটে যাওয়ার বহু বছর পরেও যে অন্য কোনো খণ্ডের কাজ শুরু করতেই পারলেন না ভারপ্রাপ্ত অন্য পণ্ডিতজনেরা, এর থেকে অনুমান করা যায় ও-কাজের জটিলতা আর শ্রমসাধ্যতা। অথচ শিশির সে কাজ করে তোলে শুধু যে অল্প সময়ের মধ্যে তা নয়—প্রায় যেন খেলাচ্ছলে। অন্তর্বর্তী সেই সময়টুকুর মধ্যে বিচিত্র-প্রাসঙ্গিক সেমিনারেরও বিরতি থাকে না তার, বিরতি থাকে না ঝরনার বেগে কবিতা নাটক রচনার, বিরতি থাকে না সংখ্যাতীত চিঠি লেখার, যেসব চিঠির কোনো-কোনোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে দাঁড়ায় সাহিত্যবিচার, কোনো-কোনোটা অফুরন্ত হাস্যমুখরতায় ভরাট কোনো সাহিত্যরচনা যেন। কবিতা বা নাটক বা এই সব সৃষ্টিকাজ যেন তার অবসরযাপন, অন্যসব কাজের চারপাশে কেবলই তা উপচে পড়ছে।

তার মতো আদ্যন্ত বাঙালি স্বভাবের মানুষকে আমরা পরিহাস করে কখনো কখনো বলতাম খাঁটি ইংরেজ। সেটা এজন্য নয় যে বিলেতে কয়েকবছর কাটিয়ে এসেছে সে। সমস্ত আনন্দ-আহ্লাদের মধ্যে থেকেও, আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও, ওর চালচলনে আর দিনযাপনে ছিল এক অভ্যন্তরীণ ছন্দ আর শৃঙ্খলা, যাকে প্রায় সাহেবি শৃঙ্খলা বলে মনে হতে পারত। তাছাড়া, ঐতিহ্যটানের সূত্রেই, ব্রিটিশ ভারতের বিষয়েও ওর ছিল এক স্বীকৃতিমূলক শ্রদ্ধা। প্রায় তিরিশ বছর আগে, দিল্লির পথে পথে পায়ে হেঁটে ঘুরতে ঘুরতে, পথবিন্যাস গৃহবিন্যাস আর ইতিহাসবিন্যাস বোঝাতে বোঝাতেএক সরল আবেগ নিয়ে বলে উঠেছিল শিশির এসবও কিন্তু অগ্রাহ্য করা যায় না। ইংলন্ডের এবং ইয়োরোপের একটা প্রচণ্ড প্রভাব মনের মধ্যে যে পড়েছিল, এখনও যে সেই প্রভাব জেগে আছে আমার সত্তায় তা অকপটে স্বীকার করব—বছর দুয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে এটা বলেও ছিল শিশির। উপনিবেশের কুফলগুলি অন্য কারো চেয়ে সে কম জানত বা কম ভাবত তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে সে মনে রাখত মিশ্রণের কথা সমন্বয়ের কথা, প্রাচ্যপ্রতীচ্যের অতীত অথবা আজও জায়মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কজটিলতার কথা, গ্রহিষ্ণুতার কথা। প্রত্যাখ্যানে বা উদাসীনতায়, অভ্যর্থনায় বা আকর্ষণে, মন্থর গ্রহণে বা বেদনাতুর সমর্পণে কীভাবে প্রতীচ্যের সঙ্গে বিচিত্র সেই সম্পর্ক তৈরি করেছে উপনিবেশের ভারত, এইটেই ছিল তার প্রধান এক ভাবনার বিষয়। আর, সেইসব ভাবনা বা কৌতূহল থেকেই—এক দিকে যেমন সে গড়ে তুলতে চেয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা গোটা ভারতের সামনে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ইংরেজি-রচনাবলি—অন্য দিকে সে খোঁজ নিতে চেয়েছে ভারত আর পশ্চিমজগতের মুখোমুখি হবার নানা ইতিহাস। বহু গবেষণার কাজকে অতিক্রম করে সে-ইতিহাস শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পারে কোন্ অন্তঃসারের সন্ধানে আর সৃষ্টিতে, 'অলৌকিক সংলাপ' নামে তার দোসরহীন বইখানির মধ্যে তার পরিচয় ধরা আছে। তার মনের মধ্যে অবিরত ঘুরে বেড়াত প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সংস্কৃতির সম্পর্কজাত এমনই এক সংলাপমালা।

এগারো বছর আগেকার এক বক্তৃতায় শিশির প্রশ্ন তুলেছিল বিদ্যায়তনে সাহিত্য আমরা পড়ব কেন? কিংবা পড়ব কীভাবে? শুধু বক্তৃতা নয়, যে-কোনো বৈঠকে অল্পবয়সীদের সঙ্গে যে-কোনো আলাপমুহূর্তে, এই প্রশ্নটা সে তুলতে চাইত। এটা যে একটা ভাববার মতো কথা, এই বোধটা সে জাগিয়ে তুলতে চাইত অন্যদের মনে। তার নিজের মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল, সাহিত্য পড়বার একটা তাৎপর্য পাওয়া যায় তখনই, যখন তার পাঠ আমাদের আরো একটু মানবিক করে তোলে, প্রতিমুহূর্তে আমাকে যুক্ত করে দেয় বিশ্বের সঙ্গে। 'মানুষে মানুষে যে সামাজিক ঐক্য আমাদের সমস্ত কর্মকে তাৎপর্য দেয়' সেইখানেই আমাদের পৌঁছে দিতে পারে সাহিত্যের পাঠ। অনেক অনেক সাহিত্য পড়বার পরেও সেখানে অনেকে আমরা পৌঁছতে পারি না, অনেকসময় বরং গণ্ডিবদ্ধ হতে হতে ভীতিপ্রদ এক সংযোগহীনতার শুকনো হাওয়ায় জড়ো হতে থাকে আমাদের সাহিত্যপাঠের পাণ্ডিত্য। কিন্তু শিশির তার অশেষ বিদ্যাবত্তা আর বিদ্যাচর্চা নিয়েও থাকতে পেরেছিল সেই গণ্ডির বাইরে সজীব এক মানুষ হিসেবে, তার পক্ষে সত্যি হয়ে উঠেছিল বিশ্বের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের সংযোগ। যে-কোনো নতুন মানুষকে তাই সে অনায়াসে নিজের করে তুলতে পারত, তারাও তাকে মনে করতে পারত নিবিড় আত্মীয়। আত্মপরিচয়ের ছলে সে লিখেছিল একবার যে সে 'এমন একজন মানুষ যে জ্ঞানের জগতের সঙ্গে কর্মের জগৎ এবং আত্মজগতের সঙ্গে বিশ্বজগতের সমন্বয়ে বিশ্বাসী এবং প্রত্যাশী'। সে হয়তো জানত না, কিন্তু আমরা অনেকে জানতাম, সেই বিশ্বাস আর প্রত্যাশা সফল ছিল তার জীবনে, তার লেখনে; সে ছিল আদ্যন্ত এমনই এক সমন্বয়ের আর সংযোগের মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদাসীন এক ডাক্তার

কিছুদিনের জন্য বর্ষীয়সী এক পরিচারিকা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। কথা বলতেন খুব। বিস্তারিত বলতেন তাঁর ব্যক্তিজীবনের গল্প কখনো, কখনো-বা তাঁর অঞ্চলের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথাও। সে-রকম কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ একটা যোগও ছিল।

রাতে আমরা খেতে বসেছি একদিন, আর খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলে চলেছেন সে-রকমই কিছু বৃত্তান্ত, সেইসঙ্গে নিজের অসুখবিসুখ নিয়েও কথা। মানুষটি ছিলেন শীর্ণ। সেই শীর্ণতা যে একদিন মরণ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারত, সেদিন শোনাচ্ছিলেন সেইসব প্রসঙ্গ। জটিল একটা ব্যথা হয়েছিল পেটে, যন্ত্রণায় অস্থির, কাছাকাছি কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় কাজ হচ্ছে না কিছু, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হলো মেডিক্যাল কলেজে। একজন ডাক্তার সেখানে দেখে বললেন তখনই অপারেশন করতে হবে। ভয় হলো খুব, কিন্তু কী আর করা, করতে তো হবেই! হলোও সেটা। ভালোও কিন্তু হয়ে গেলাম। কী ভালো যে সেই ডাক্তারবাবু! অপারেশনের পর তিন দিন তিন রাত্রি ঠায় বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রইলেন পাশে। যখন আর ভয় কিছু রইল না, তখন গেলেন বাড়ি।

'এ-রকম ডাক্তারও হয়?'

'চোখে তো দেখলাম আমি। শুধু কি তাই? চলে আসব যখন, বললেন: এখনই হবে না যাওয়া। বাড়ি গিয়ে খাবেন কী? টাকাপয়সার অবস্থা তো বুঝতে পারছি। থাকুন এখানে কিছুদিন। অন্তত একমাস। থেকে গেলাম সেই একমাস। রোজ এসে দেখে যেতেন আর সেইসঙ্গে নিয়ে আসতেন কিছু ফলমূল। তার পরে যেদিন ছুটি দিতে এলেন, হাতে দেখি বড়ো বড়ো দুটো ঠোঙা। কী আছে ওতে? বললেন: নিয়ে যান সঙ্গে, বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত খাবেন। ঠিকমতো না খেলে কিন্তু আবার অপারেশন করতে হবে, তখন কিন্তু আর বাঁচানো যাবে না। চলে এলাম সেসব সঙ্গে নিয়ে। একটা ঠোঙায় অনেক ফল, অন্যটায় কয়েকটা হরলিক্সের শিশি। দেবতুল্য মানুষ না? সেই ডাক্তারবাবু দয়াতেই তো বেঁচেবর্তে আছি এতদিন। এখন আমি রোগা, কিন্তু অসুখ করেনি আর।'

'এ তো প্রায় গল্পের মতো!'

'তা-ই তো! দেখা যায় না এ-রকম। তবে, ভীষণ রাগি কিন্তু উনি, কথায় কথায় বকাবকি করেন ভীষণ, একেবারে চণ্ডালরাগ। সবাই ভয় পেত ওঁকে।'

এই শেষ কথাটায় চমক লাগে আমার। ডাক্তার, মেডিক্যাল কলেজ, অপারেশন, শুশ্রূষা, ভাবীকালের পথ্যব্যবস্থা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসবের সঙ্গে ওঁর অনিবার্যভাবে মনে পড়ছে চণ্ডালরাগেরও কথা। তবে কি এঁকে আমি চিনি?

জিজ্ঞেস করি: 'নাম মনে আছে সেই ডাক্তারবাবুর?'

'মনে থাকবে না? প্রাণ দিলেন যিনি তাঁর নাম ভুলে যাব? তাঁর নাম ডাক্তার বি.এন. গুহ রায়।'

মিলে যায় সব। বি.এন. গুহ রায়? তার মানে আমাদের ভূমেন্দ্র গুহ? তবে তো ঠিকই বুঝেছিলাম। এতগুলি সম্মেলন আর কার মধ্যেই বা হবে! জিজ্ঞেস করি: 'পরে আর দেখা হয়নি কখনো?'

'না, বহুবছর হয়ে গেল তো। প্রথম প্রথম কিছুদিন দেখাতে যেতাম। তার পর আর দেখা হয়নি।'

'সে কী! উনি যে প্রায়ই আসেন এ বাড়িতে, চোখে পড়েনি তখনও?'

'এ-বাড়িতে আসেন? ও মা! দেখিনি তো কখনো? আবার এলে আমাকে একটু বলবেন? প্রণাম করব একবার। অত বড়ো মানুষ!'

রবিবারের এক আড্ডায় অনেকের সঙ্গে ভূমেনও আছেন সেদিন। ডেকে আনি সেই পরিচারিকাকে, আর ভূমেনকে বলি: 'দেখুন তো একে চিনতে পারেন কি না।'

উদ্যত প্রণামকে বিপুল উদ্যমে প্রতিহত করবার পর আড়ে একটু দেখে নিয়ে বললেন: 'কে ইনি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডাক্তারবাবু, চিনতে পারছেন না আমায়? ওই-যে, মেডিক্যাল কলেজে পেটের একটা অপারেশন করে বাঁচালেন আমাকে, তার পরেও এক মাস রেখে দিলেন দেখাশোনার জন্য—'

'ও, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ভালো আছেন তো এখন? তাহলেই হলো।'

পরিচারিকাটি আরো কিছু বলতে চাইছিলেন হয়তো, তদ্‌গত কোনো শ্রদ্ধার প্রকাশ, কিন্তু ভূমেনের মুখভঙ্গিতে তেমন-কোনো সাড়া না পেয়ে দূরে সরে গেলেন আস্তে আস্তে।

আর, সেই সরে যাবার পরে, বলতে শুরু করলেন ভূমেন: 'এর তো বাঁচবারই কথা ছিল না।'

'মনে আছে আপনার? এত রোগীর মধ্যে একজনকে?'

'থাকবে না মনে? একটা নতুন অপারেশনের এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়েছিল তো এঁরই ওপর।'

'এক্সপেরিমেন্ট?'

'শুনুন, এঁর যে অসুখটা হয়েছিল, সেটা বেশ শক্তই। তখনকার দিনে তার একটা অপারেশন-পদ্ধতি ছিল, কিন্তু তার ফল হতো দু-রকম। হয় মরে যাওয়া, আর তা না হলে বেঁচে মরে থাকা। মানে, কোনো এক বা একাধিক অঙ্গ একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া। সেইজন্য কিছুদিন ধরে একটা বিকল্প পদ্ধতি খুঁজছিলাম। একসময়ে মনে হলো পেয়েও গেছি সেটা। আমাদের স্যারকে বোঝালাম একদিন। তত্ত্বগতভাবে উনি মেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলেন, কিন্তু খুব-যে নিশ্চিন্ত হলেন তা নয়। একটা কুকুরের উপর পরীক্ষা করে উতরে গেল। তার পরেই ইনি এলেন। স্যারের কাছে অনুমতি চাইলাম নতুন অপারেশনটার জন্য। উনি ইতস্তত করছেন দেখে বললাম, যদি মারাও যান, বেঁচে মরে থাকার চেয়ে সেটা ভালো না? শেষ পর্যন্ত মত দিলেন উনি। হলো অপারেশনটা, তারপর তো দেখছেন এতগুলো বছর কেটে গেল।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে পরিচারিকাটি শুনছিলেন এই বৃত্তান্ত। কিন্তু তাঁর জীবনদাতার সামনে আসবার আর চেষ্টা করেননি, ধমক খাবার ভয়ে।

২

শুধু এই অপারেশন নয়, আমাদের কারো কারো জানা ছিল যে হার্ট-অপারেশনের বিশেষ একটা পদ্ধতি বি.এন. গুহরায় পদ্ধতি হিসেবেই গোটা বিশ্বে পরিচিত। জানা ছিল সেটা, কিন্তু তাঁর চলাচলন হাবভাব বা পোশাক-আশাকে অনেকেরই পক্ষে সেটা বিশ্বাস করা শক্ত হতো। পায়ে চপ্পল, পরনে একটা ঢোলা পাজামা আর ফতুয়া গোছের একটা জামা কিংবা হয়তো পুরোপুরি একটা হাফহাতা শার্টই। তুখোড় আড্ডায় মেতে আছেন, সুতীব্র সম্ভাষণে কাউকে কাউকে সে-আড্ডা থেকে উৎখাত করে দিচ্ছেন কখনো-বা, কখনো নিজেই নিষ্ক্রান্ত হতে চাইছেন বিপুল রোষে, কখনো বিশ্বসাহিত্য বা দর্শনভাবনা নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলে চলেছেন আয়াসহীন স্রোতে, মাঝে মাঝে কেবল এই ব্যাজস্তুতিটুকু রেখে যে 'আপনারা তো সবই জানেন, আপনাদের আর কী বলব'— এই মানুষটি ডাক্তার? এতসব ভাবেন-বা কখন আর চিকিৎসা-বা করেন কখন?

ঠিকই, অবসর নিয়েছেন তিনি, সর্বার্থেই অবসর। সরকারি কাজ শুধু নয়, ব্যক্তিগত চেম্বার থেকেও। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে দরগা রোডে একটা চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরি করে তুলবার আয়োজনে ছিলেন, কিন্তু তরুণ কবিদের সমবায়ে সেই 'দরগা রোড' হয়ে দাঁড়াল এক কবিতাপত্র। কবিকেন্দ্র আর চিকিৎসাকেন্দ্র— দুটোই বন্ধ হয়ে গেল অচিরে। তাই ডক্টর বি.এন. গুহরায়ের যেন আর অস্তিত্ব রইল না, যেন এখন তিনি ভিন্ন এক মানুষ। ভিন্ন মানুষ; কিন্তু যে-মুহূর্তে কানে এসে পৌঁছয় কোনো পরিচিতজনের ঈষন্মাত্র রুগ্‌ণতার খবর, প্রায় যেন উপযাচক হয়েই তিনি ব্রতী হয়ে পড়েন তার চিকিৎসার কাজে। একদিন হয়তো ফোন করে বললেন: 'বাড়িতে কারো অসুখের কথা শুনলাম!' 'কোথায় শুনলেন?' 'শুনলাম জনরবে। আপনারা তো আর জানাবেন না। কত বড়ো বড়ো নার্সিং হোমের সঙ্গে যোগ আপনাদের! আমাদের মতো গরিব ডাক্তারকে কি আর খবর দেবেন আপনারা? তবে, একটু-আধটু ডাক্তারিটা তো কষ্ট করে পড়তে হয়েছিল। সেই অল্পস্বল্প বিদ্যেয় যা মনে হচ্ছে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী মনে হচ্ছে তা বলতে লাগলেন এর পর। অসুখটাই -বা কী হয়ে থাকতে পারে, তার উপসর্গ লক্ষণগুলিই-বা কী, আর কোন্ বিধিতে সহজেই তার আরোগ্য হতে পারে— এমন সব বিষয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ রেখে দিলেন ফোন।

তাঁর এই উপচিকীর্ষার কথা ভাবছি বসে, কেটে গেছে খানিকটা সময়, ঘন্টি বেজে উঠল দরজায়। কে এল এই সময়ে? তড়িঘড়ি দরজা খুলে দেখি: সামনেই দাঁড়িয়ে ভূমেন। একটু আগেই কথা হলো, তখন তো বলেননি এই আসার সম্ভাবনার বা ইচ্ছের কথাটা? অবশ্য বলতেই যে হবে তারই-বা কী মানে আছে! হঠাৎ ইচ্ছে তো হতেই পারে।

শান্তভাবে বসলেন এসে। আড্ডায় মেজাজেই শুরু হলো কথা। একটু পরে, নিতান্তই আলতো ভঙ্গিতে, পকেট থেকে বার করলেন ভাঁজ-করা এক কাগজ। আমার দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন: 'স্বচক্ষে দেখে নিন।'

কী দেখব? দেখি বড়োসড়ো একটা ছাপানো কাগজ, ইংরেজিতে লেখা। তার কয়েকটা লাইন হাইলাইটার দিয়ে চিহ্নিত করা, সহজে যাতে চোখে পড়ে। 'কী দেখব এটায়?' 'পড়ে দেখুন অসুখটার বিষয়ে কী লেখা আছে।' 'সে তো আপনিই বলে দিলেন এতক্ষণ ধরে।' 'মনে হলো আমার কথার আপনার খুব-একটা প্রত্যয় হয়নি। অথেন্টিসিটি বোঝাবার জন্য এটা নিয়ে এলাম।' 'কিন্তু এ তো মনে হচ্ছে একটা বইয়ের পাতা!' 'হ্যাঁ, বইয়েরই তো। গোটা বইটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো নিয়ে আসতে পারি না বাসে, খুবই মোটা বই। তাই কেটে নিয়ে এলাম পাতাটা। আপনাকে দেখাতে হবে তো!' 'তাই বলে একটা বইয়ের পাতা কেটে ফেললেন?' 'তা আর কী হবে, আমারই তো বই। কিন্তু এই-যে পড়ে দেখুন, এখানে কী লেখা আছে—'

কিন্তু বইয়ের লাইনগুলির দিকে নয়, সেদিকে তাকিয়ে আমি কীই-বা বুঝব, তাকিয়ে রইলাম শুধু ব্যাখ্যানরত ভূমেনেরই মুখের দিকে।

৩

কখনোই ওঁকে খবর দিই না অসুখবিসুখের, এ-অনুযোগটা অবশ্য যথার্থ নয়। প্রায় কুড়ি বছর আগে ডক্টর বি.এন. গুহরায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর থেকে আমাদের বড়ো পরিবারের বড়োসড়ো অসুখগুলিতে অনিবার্যতই শরণ নিয়েছি তাঁর। চোদ্দ বছর আগে হৃদ্‌যন্ত্রের আকস্মিক একটা সমস্যা হয় আমার এক ভ্রাতৃবধূর, মানিকতলার কাছে ছোটো একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করা হলো তাকে, সেখানে ভূমেন্দ্র গুহের প্রাক্তন ছাত্ররা কেউ কেউ আছেন। সাব্যস্ত হয়েছে পেস-মেকার বসাতে হবে এবং ভূমেন নিজেই সেটা করবেন।

নার্সিং হোমের ভিতরে আছেন ভূমেন, আমরা অনেকেই বাইরে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ। কাজ শেষ করে ভূমেনও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন ভিড়ের মধ্যে, তাঁর সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিখ্যাত অ-ডাক্তারসুলভ পোশাকে। শুভার্থীদের মধ্যে তখন প্রবল এই অনুযোগ-গুঞ্জন চলছে: এমন একটা অখ্যাত ছোটো জায়গায় কেন আনা হলো রোগিণীকে, দক্ষিণের এত ভালো ভালো জায়গা যখন ছিল। ভালো ডাক্তারও পাওয়া যেত সেখানে। সে-অনুযোগে সায় দিয়ে ভূমেনও বলছেন গলা মিলিয়ে: 'বটেই তো, বটেই তো', কিছু-বলতে-উদ্যত-আমাকে থামিয়ে দিচ্ছেন চোখ টিপে।

কিংবা ধরা যাক ঠিক-ঠিক এগারো বছর আগে আমাদের এক পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা। হঠাৎই জটিল একটা আক্রমণ হলো দাদার শরীরে, সচরাচর যেমনটা ঘটে না। চটজলদি আঞ্চলিক একটি নার্সিং হোমে দেবার পর ভূমেনরই চেষ্টায় রোগীকে সরিয়ে নেওয়া গেল স্থানাভাবক্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজে, একসময়ে যেখানে প্রধান ছিলেন তিনি। চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া তো সম্ভব নয় সেখানে অবসরপ্রাপ্ত কোনো ডাক্তারের পক্ষে, সে-দায়িত্ব রইল তাঁরই একাধিক ছাত্রের হাতে। চিকিৎসা করেননি তিনি, কিন্তু ভর্তি হবার সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় একমাস সময় জুড়ে নিত্য তিনি থেকেছেন আমাদের সঙ্গী হয়ে, আমাদের সঙ্গ ছাড়াও কখনো-বা, সুসংগত ভাবে চিকিৎসা চলছে কি না প্রত্যক্ষে তা জানবার জন্য।

তেমনই এক বিকেলবেলায়, দাদার কেবিনের বাইরে অপেক্ষা করছি আমরা, সঙ্গে ভূমেন। রোগী বিশেষ প্রযত্নে আছেন বলে ভিতরে ঢুকতে পারছি না আমরা, আপাতত কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নার্সেরা আছেন সেখানে। হঠাৎ ভূমেন বলেন: 'কী করছে এরা এতক্ষণ? দাঁড়ান, একটু দেখে আসি।'

প্রাক্তন প্রধান হিসাবে তিনি তো তা পারেনই, কিন্তু ইতিমধ্যেই দু-একটা অভিজ্ঞতার জেরে অনুরোধ করি তাঁকে: 'বকাবকি করবেন না যেন।'

'না না, বকাবকির কী আছে। দেখে আসি দিদিমণিরা কী এত করছেন।'

মিনিট পাঁচেক পর ভিতরে একটা তুমুল চ্যাঁচামেচি শুনে দুশ্চিন্তা হলো। কী ঘটেছে ভিতরে? ভাবনাটা শুধু হতে-না-হতেই দেখি জোরকদমে ঘর থেকে ছিটকে এলেন একজন নার্স, তাঁর ধবধবে মুখ তখন টকটকে লাল। 'কী হলো?' কিন্তু সে-প্রশ্নের কোনো তোয়াক্কা না করে কিছু একটা বিড়বিড় করতে করতে বিপুল বেগে চলে গেলেন তিনি।

অগত্যা ঘরে ঢুকে উত্তপ্ত ভূমেনকে প্রশমিত করবার চেষ্টায় তাঁকে নিয়ে আসি বাইরে। জিজ্ঞেস করি: 'কী হলো হঠাৎ?'

'কী আর হবে। কয়েক মিনিট ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। যত অপদার্থের দল! এইভাবে একটা হাসপাতাল চলছে। একটা খুব দামি দরকারি যন্ত্র আছে ও-ঘরে, আমারই সময়ে কেনা, সেটা এখন ব্যবহার করবার কথা। কিন্তু হচ্ছে না ব্যবহার। আমি ঠাণ্ডাভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম ওটা কাজে লাগাচ্ছেন না কেন। অনায়াসে মেয়েটা বলল যে অনেকদিন ধরে ওটা বিগড়ে আছে। বিগড়ে আছে? সারাবার কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা হয়েছে? কাউকে কি জানানো হয়েছে? না, সেটা না কি তাদের কাজ নয়। এর পর মেজাজ ঠিক রাখা যায়? ঠিক রাখা উচিত? বললাম ওকে, আমি যদি থাকতাম এখনও, তবে তো আজই আপনাকে বরখাস্ত করতাম। সেইজন্যেই রেগে গেছেন শ্রীমতী, বেরিয়ে গেলেন গটগট করে। কী আর করা!'

বাঁচানো যায়নি দাদাকে। কিন্তু চিকিৎসাপর্বের গোটা সেই দুঃসহ সময়টা জুড়ে, রাতের বেলাতেও ফোন করে খবর দিতেন তিনি, তাঁর চিকিৎসক ছাত্রের কাছ থেকে শেষতম খবর নিয়ে তা বিশদে বলতেন আমাদের, কোনো কোনো দিন এমনকী রাত দেড়টা-দুটোতেও।

দাদাকে বাঁচানো যায়নি, কিন্তু ভূমেনেরই পরামর্শে বিস্ময়কর ভাবে বাঁচানো গিয়েছিল আমাদের চেয়ে অনেক ছোটো এক আত্মজনকে। তার পায়ে একটা অসুবিধে চলছিল কিছুদিন ধরে, গোড়ালি আর বুড়ো আঙুল এমনভাবে ফুলে গিয়েছিল যে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল হাঁটাচলা। ব্যথার দুঃসহতা বুঝে তার ছেলে তাকে ভর্তি করে দিল দক্ষিণ কলকাতার প্রখ্যাত বিশাল এক নার্সিং হোমে। সাত দিনের জন্য রাখতে গিয়ে গড়িয়ে গেল তিন সপ্তাহ, নানা পরীক্ষার অন্ত নেই, অন্ত নেই ওষুধপত্রের আর বিশেষজ্ঞদের যাওয়া আসার, কিন্তু অসুস্থতা তবু বেড়েই চলছে, রোগীও আর বন্দী থাকতে নারাজ। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, বড়ো-একটা অপারেশন করাতে হবে অচিরে। আর তার জন্য লাগবে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক সেই সময়টার একটা খবর দিয়েছিলাম ভূমেনকে। একটু কি দেখবেন উনি? বৃত্তান্তের কিছুটা শুনেই ভূমেনের প্রথম প্রশ্ন: 'রোগীর বা তাঁর ছেলের নিশ্চয় অনেক টাকা? খুব বড়োলোক? টাকার শ্রাদ্ধ করতে না চাইলে প্রথমেই ওখান থেকে বার করে নিতে বলুন। তারপর দেখা যাবে। মনে হয় না তেমন বড়ো কোনো সমস্যা। শুধু শুগারটা একটু কমাতে হবে তাড়াতাড়ি।'

কাজ হলো সেইমতোই। এবারে কী করা? রোগী তো চলাফেরা করতে পারে না, তাহলে ডাক্তারবাবু কি আসবেন একবার দেখতে?

'হ্যাঁ, দেখব। তবে তাদের বাড়িতে নয়। আপনার বাড়িতে।'

'কিন্তু তিনতলায় তো উঠতে পারবে না সে।'

'দরকার নেই উঠবার। একটা ট্যাক্সিতে করে— না না, ওঁদের নিশ্চয় গাড়ি আছে— গাড়িতে করে নিয়ে আসতে বলবেন। আপনার ঘর থেকে নীচে নেমে আমি দেখে নেব।'

নিয়ে আসা হলো রোগীকে। ছেলে উঠে এল তিনতলায় কাগজপত্রসুদ্ধ। সেগুলো উলটেপালটে একটু দেখে নিয়ে, উঠে পড়লেন ভূমেন, নামলেন নীচে, গাড়িতে-বসা রোগীর পা-টা একটু দেখে নিলেন টর্চের আলোয়, তারপর উঠে এলেন আবার। ছেলেকে বললেন: 'বাড়ি নিয়ে যান, চিকিৎসা আপনি নিজেই করতে পারবেন, ছোট্ট একটা ব্লেড কিনে নেবেন শুধু। আর নিজের যদি ভয় করে তো পাড়ার যে-কোনো ডাক্তারকে ডেকে বলবেন জায়গাদুটো ব্লেড দিয়ে একটু চিরে দিতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতভম্ব ছেলেটি বলে 'তারপর?'

'তারপর আর কী! আর কিছু করতে হবে বলে মনে হয় না। তবে অল্প কিছুদিন শুয়ে থাকতে হবে। তারপর যদি আরো টাকা খরচ করতে ইচ্ছে হয় তো দেবেন আবার একটা নার্সিং হোমে। টাকা বেশি হলে কত সমস্যা!'

রোগীকে নিয়ে ফিরে গেল তার ছেলেটি। আর ভূমেনের সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করে সারিয়ে তুলল তার বাবাকে, যে-বাবাকে নার্সিং হোমে কয়েক লাখ টাকার অপারেশনের প্রস্তাব দেবার পরেও বলা হয়েছিল যে জীবনের অবশ্য কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না।

পাঁচ বছর কেটে গেছে তারপর। হেসেখেলে বেশ সুস্থই আছে এখন সেই রোগী, আমাদের সেই আত্মজন, ছোটো মাপের একটা ব্লেডের কল্যাণে, বড়ো মাপের একজন মানুষের প্রশ্রয়ময় ক্ষণিক পরামর্শে। তার ছেলেটি প্রায়ই উচ্চারণ করে ডাক্তারবাবুর নাম, কিন্তু কখনোই বলে না বি.এন. গুহরায় বা ভূমেন্দ্র গুহ, বলে 'জীবনদাতা'।

কিন্তু 'কবিসম্মেলন'-এর মতো পত্রিকায় একজন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এত কথা কেন? কেননা, ডাক্তার আর রোগীদের কাছে ইনি ধন্বন্তরি এক ডাক্তার, কবি আর পাঠকদের কাছে ইনি প্রগাঢ় এক কবি, গবেষক আর ভাবুকদের কাছে বিস্ময়কর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষক। পরম-লিপ্ত কিন্তু পরম-উদাসীন বিচিত্রমুখী এই মানুষটির স্বতঃপ্রণোদিত উপচিকীর্ষার কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে সবসময়েই। সেই সঙ্গে এও ভাবি, রক্তে যাঁর এত চিকিৎসাবোধ, এই প্রায় কুড়ি বছর ধরে নিজেকে তিনি নিয়মিত চিকিৎসাকাজের বাইরে রাখতে পারেন কোন্ মন্ত্রবলে, কোন্ উদাসীনতায়! উদ্দীপ্ত উদাসীন সেই মানুষটিকে আজ আমার ভালোবাসা জানাই।

২০১৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদ্যুম্নর বই

বছর দেড়েক আগে বাংলা একটি প্রবন্ধের বই ছাপা হয়েছে 'টীকাটিপ্পনী'। লেখকের নাম প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য। আমার মনে হয়েছিল বইটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে শহরে বেশ-একটা হৈচৈ হবে। হৈচৈ মানে কি কোনো উৎসব? তা নয় ঠিক। চিন্তাভাবনায় যাঁদের আগ্রহ আছে, ভালো লেখা পড়বার জন্য প্রতীক্ষা আছে যাঁদের, বাংলা প্রবন্ধে মৌলিক কিছুই লেখা হয় না বলে বিলাপ করেন যাঁরা, ভেবেছিলাম তাঁরা হয়তো বইটিকে নিয়ে কথা বলবেন, তর্ক তুলবেন, আর সেই সূত্রে বীজগর্ভ এই বইখানিকে ভালোবাসবেন। কিন্তু সেই আলোড়নটা দেখতে পাওয়া গেল না এখনও।

তা পাওয়া গেল না, তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি যে একজন-দুজন তরুণের পক্ষে বইটি হয়ে উঠেছে যেন কোনো নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের মতো। কলেজ স্ট্রিটের দোকানে-দোকানে ঘুরছেন একজন 'টীকাটিপ্পনী'র পূর্বতন বইগুলি সংগ্রহ করবার জন্য, এমন একটা ঘটনার কথা জানি। অন্য কোনো বই যে এই লেখকের নেই, দোকানির সেসব কথায় নির্ভর করতে অসুবিধেই হচ্ছিল সেই পাঠকের। এ কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে পারে যে এটিই একজন লেখকের প্রথম প্রবন্ধের বই? এ কি হতে পারে যে এমন একখানি বইয়ের আগে অন্য কিছুই লেখেননি তিনি? দোকানে প্রতিহত হয়ে অগত্যা লেখকেরই সঙ্গে প্রত্যক্ষ একটা সংযোগ তৈরি করে নেন তাঁর সেই পাঠক। যেসব লেখা তিনি লেখেননি, সেসব বুঝে নেওয়ার জন্য, এমনকী তাঁকে দিয়ে সেসব লিখিয়ে নেওয়ার জন্য সুধীর উশ্‌কানি চলতে থাকে সেই পাঠকের।

লিখিয়ে নেওয়া শক্ত অবশ্য। আমাদের চটজলদি রচনাশীলতার জগতে, পরিমাণ বা সংখ্যাই যেখানে গুরুত্বের নির্ধারক, সেখানে এই এক লেখক ছোটো একটি প্রবন্ধ লিখবার জন্যে সময় নেন বড়ো বেশি। অত সময় কোথায় আমাদের? অত তাড়া-ই বা দেয় কে!

কোজিন্‌ত্‌সেভ-এর 'কিং লিয়র' প্রদ্যুম্নকে মুগ্ধ করেছে শুনে এর একটি রিভিউ লিখে দিতে বলেছিলেন কোনো এক পত্রিকার সম্পাদক। পরিচিতজনদের বিস্মিত করে দিয়ে প্রদ্যুম্ন তাতে রাজি হয়ে যান। বিস্মিত, কেননা কোনো লেখায় তাঁকে প্ররোচিত করা খুব শক্ত। তারপর, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, বছর যায়। লেখাটি পাওয়া আর সম্ভব নয় বলে বুঝতেই পারেন সম্পাদক, হাল তো কখনো কখনো ছেড়েই দিতে হয় তাঁদের। কিন্তু না, কথা দিয়ে কথা না রাখবার লোক নন প্রদ্যুম্ন। দু-বছর পর সন্তর্পণে সম্পাদক সমীপে হাজির তিনি সেই লেখা নিয়ে 'কিং লিয়র, সিনেমার কবিতা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচনার জন্য ওইটুকু সময় লাগা কি খুব স্বাভাবিক নয়? প্রদ্যুম্নর অপ্রতিভ চোখেমুখে এই অনুক্ত প্রশ্নটা থেকেই যেত তার প্রস্তুতিকালে। ফিল্মটির আলোচনাই যদি করতে হয়, তবে তো বারে বারেই দেখা দরকার সেটা, না কি? আর তখনই তো বলা যাবে যে 'এই ছবি ফিরে ফিরে দেখা মানে প্রতিবার আবিষ্কার করা, প্রত্যক্ষণের পরিধি ক্রমাগত খুলে খুলে দেওয়া।' এ যদি কথার কথা না হয়, এ বাক্যকে যদি সত্য করে তুলতে হয়, তাহলে 'ফিরে ফিরে দেখা'র জন্য তো সময় চাই? এমন তো নয় যে-ছবিটি কোনো সিনেমাহলে অবিরত দেখানো হচ্ছে আর যে কোনো সময়ে তা দেখে নিলেই হলো! কোথায় কোন্ মফস্বলের ফিল্ম ক্লাবে দেখানো হচ্ছে সেটা, তার প্রতীক্ষাতেই তো কেটে যায় কত সময়।

আর, শুধু 'লিয়র'ই তো নয়; কোনো পরিচালকের ছবির বিচার করতে গেলে তাঁর অন্য ছবিগুলিকেও তো জানতে হবে অনুপুঙ্খে, জানতে হবে তাঁর দেশের সিনেমাশিল্পের ঐতিহ্য, তাঁর দেশের সমসময়। আবার, বিষয় যখন 'কিং লিয়র', বিষয় যখন 'শেক্সপিয়র', তখন রুশ দেশের শেক্সপিয়র-চর্চার ইতিহাসটাও তো জানা চাই। আদ্যোপান্ত জানা চাই 'কিং লিয়র' নাটকটাকে। আর জানা চাই শিল্প হিসেবে সিনেমার আর কবিতার যথার্থ চারিত্র, তাদের অন্তঃসম্পর্ক।

এটুকু প্রস্তুতি না নিয়ে কী করে লেখা সম্ভব কোজিন্ত্সেভ-এর 'কিং লিয়র' নিয়ে কোনো সমালোচনা? দুবছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়টা তাই কিছুই নয়। আর এইভাবে, বাইশ বছরে লেখা এগারোটি প্রবন্ধ নিয়ে বেরল দুশো চোদ্দো পৃষ্ঠার 'টীকাটিপ্পনী', পঁয়ষট্টি বছর বয়সে প্রকাশিত লেখকের প্রথম বই।

প্রস্তুতির ওই আয়োজন শুনে অনেক সময়ে আমাদের একটা ভয়ও তৈরি হতে পারে। মনে হতে পারে যে এ বই খুললে হয়তো স্তূপ করা পাণ্ডিত্যের এক জটিল আবর্তের মধ্যে গিয়ে পৌঁছব, কিংবা পৌঁছব কোনো অন্ধকার করে দেওয়া তত্ত্বভারে। বস্তুত, এইখানেই এ বইয়ের সবচেয়ে বড়ো মুক্তির স্বাদ বিদ্যা এখানে সহজেই প্রজ্ঞা হয়ে ওঠে, তত্ত্ব এখানে স্বচ্ছন্দ এক জীবনদৃষ্টি। আমাদের প্রবন্ধের জগতে এই এক সর্বনাশ যে এখানে পণ্ডিতদেরই সঙ্গে কথা বলেন পণ্ডিতেরা, উৎসুক সন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকদের সঙ্গে কথা বলবার মতো মানুষজন প্রায় নেই। সেই দমচাপা জ্ঞানের আবহাওয়ার মধ্যে এ এই একটা খোলা হাওয়ার মতো। লেখক এখানে পাঠকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোন, তাঁর গদ্যের প্রত্যেকটি শব্দকে প্রায় কবিতার যত্নে চয়ন করে আনেন, সেই চয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর তথ্য আর যুক্তি সুঠাম এক সরলতায় বয়ে যেতে থাকে, পাঠকও তাই অন্তর্গত এক সংলাপ শুরু করে দেন সহজে। এমনটা না হয়ে অবশ্য উপায় ছিল না, কেননা লেখাটা প্রদ্যুম্নর কাছে বানানো জিনিস নয়, লেখাটা তাঁর জীবনযাপনেরই একটি প্রতিফলন। 'টীকাটিপ্পনী'র শেষ প্রবন্ধে এই একটি কথা আছে (পৃ. ২০৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...আধুনিক যুগের সমস্ত জ্ঞানকোষের উৎসে আছে এনলাইটেনমেন্টের ভাবধারা। এনলাইটেনমেন্টের ঐতিহ্যে আমির সঙ্গে না-আমির একটা দুস্তর ব্যবধান ঘটে যায়। —'না-আমি' বলতে, আমার বাইরে যা-কিছু; অন্য মানুষ, বস্তুবিশ্ব, প্রকৃতি, সবই, বোঝাচ্ছি। এনলাইটেনমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আমির সঙ্গে না-আমির একটাই সম্বন্ধ গ্রাহ্য : প্রভুত্বের সম্বন্ধ, ক্ষমতার সম্বন্ধ। কী অন্য মানুষকে, প্রকৃতিকে, এই আমি রাখতে চায় ক্ষমতার তাঁবে। তাই সমস্ত জ্ঞানকোষে দেখতে পাই একদিকে লেখক / সংকলক, অন্যদিকে পাঠক-সমাজ—একদিকে জ্ঞানদেনেওয়ালা, অন্যদিকে জ্ঞানলেনেওয়ালা—এই দুইয়ের মধ্যে একটা পাঁচিল দাঁড়িয়ে আছে, খাড়াভাবে। পাঠকসমাজ যেন জ্ঞানের শুধু অবজেক্ট বা বিষয়মাত্র; বিষয়ী নন। আর লেখক / সংকলক অবতীর্ণ হয়েছেন একচ্ছত্র জ্ঞানদেনেওয়ালার ভূমিকায়। লেখক-পাঠকের এই একমুখী সম্বন্ধের ছাঁচটাই আমরা ভেঙে দিতে চাই, একেবারে প্রথম থেকে।...

এ ছাঁচটাকে ভেঙে দেওয়াই প্রস্তাবিত লোকবিদ্যা কেন্দ্রের লক্ষ্য, এই যদি লেখক ভাবেন তো তাঁর নিজেকেও তো ভাঙতে হবে সেই ছাঁচ? 'টীকাটিপ্পনী' জুড়ে সে কাজটাই প্রদ্যুম্ন করেন।

কী এর বিষয়? স্থির কোনো বিষয় কি আছে? না কি নানা সময়ে লেখা নানা প্রসঙ্গের এই সংকলন অন্তঃসম্পর্কহীন কয়েকটি রচনার সমাহার মাত্র? সূচি থেকে সে-রকম একটা সন্দেহ তৈরি হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। পট নিয়ে, সিনেমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে, নাট্যানুবাদ নিয়ে লেখা আছে এখানে; লেখা আছে শরৎচন্দ্রের আর্কেটাইপ বা সুকুমার রায়ের 'নিরর্থ' নিয়ে; রামমোহনের গদ্য বা বিদ্যাসাগরের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে; মার্ক্সীয় ভাবনা কিংবা উপন্যাসের রাজনীতি নিয়ে।

বিচিত্র এই প্রসঙ্গগুলি, কিন্তু লেখক বলেই দেন যে এর মধ্য দিয়ে একটা প্রশ্নের উত্থাপন করতে চেয়েছেন তিনি 'সমাজ আর সংস্কৃতির সম্পর্ক, ভিতরের সম্পর্ক, কী?' কথাটা এই পর্যন্ত ভূমিকায় তিনি বলেন, যা বলেন না, অথচ যা হয়তো পাঠকের চোখমন এড়িয়ে যায় না, তা হলো : এই সম্পর্কটাকে সব সময়েই তিনি ধরতে চান আমাদের বেসরকারি সমাজের দিক থেকে। তাঁর প্রায় সব লেখারই ভিতরকার কেন্দ্র থাকে এইখানে : কমিউনিটি বা কৌম হিসেবে কোথায় আমরা মার খাচ্ছি সেইটে লক্ষ করায়, কৌম হিসেবে কোথায় আমাদের শক্তি সেইটে আবিষ্কার করায়। এই আবিষ্কারে, একদিকে যেমন তিনি শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে ধরেন, অন্যদিকে তেমনি খোঁজেন লেখকশিল্পীদের প্রত্নপ্রতিমায়, যে প্রত্নপ্রতিমা জেগে ওঠে এক যৌথ নির্জ্ঞান থেকে। তখন তিনি 'কিং লিয়র'-এ দেখেন 'জনজীবন-মথিত' বেদনার শান্ত বিধুর স্বর, এই ছবির মূল স্বর' (পৃ. ৫৬), তখন তিনি বিদ্যাসাগরকে দেখেন সেই মানুষ হিসেবে যাঁর 'কৌম এলাকায় কাজ, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অর্থে, হয়তো সবচেয়ে তাৎপর্যময়' (পৃ. ১৪৫), কিংবা, 'কৌম : আমাদের রাজনৈতিক উপন্যাস-চর্চায় এইটেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধ করি, সেই মূল প্রত্যয় যা চাবিকাঠির কাজ করতে পারে' (পৃ. ৭০)। প্রবন্ধগুলিকে ধারাবাহিক পড়ে গেলে তাই মনে হয়, 'টীকাটিপ্পনী'র মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এর অন্তর্গত আরো এক নাম কৌমের সন্ধানে।

বই জুড়ে কাজ করছে লেখকের নিজস্ব এক উৎকণ্ঠা। সে উৎকণ্ঠা হল রাষ্ট্রপ্রতাপে সমাচ্ছন্ন এই ভয়ংকর সময়টায় কোথায় গেল সেই কৌম, সেই বেসরকারি সমাজ? কীভাবে তা হতে পারে সক্রিয়, স্বপ্রতিষ্ঠ? কারা, কখন, কীভাবে সেই প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন একদিন?

'শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে গণসমাজের যোগ স্থাপনের এক পরিপ্রেক্ষিত' (পৃ ২০৭) এইভাবে বইটির মধ্যে তৈরি হয়ে ওঠে বলে আমাদের সময়ের পক্ষে একে এত সজীব এবং প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল।

১৯৯৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবেশকে নিয়ে ব্যক্তিগত

আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় বিষয়ে কোনো বিধিবদ্ধ লেখা নয় এটি। তেমন-কোনো লেখার সামর্থ্যও আমার নেই। যে ব্যক্তিদেবেশকে গত ষাট বছর ধরে অল্পবিস্তর জানি, তার বিষয়ে সামান্য কয়েকটি কথা রইল এখানে, চোদ্দ বছর পর পর পাঁচটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা।

১৯৫৪

AMARBOI.COM

বিবিবিদ্যালয়ে পড়ছি যখন, সহপাঠিনী হিসেবে বেশ কয়েকজনের আবির্ভাব হলো জলপাইগুড়ি থেকে। গল্পসূত্রে তাদের প্রিয় এক বন্ধুর নাম জানলাম দিনেশচন্দ্র রায়, পরের বছর তার সঙ্গে না কি আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা। তার ধীমত্তা এবং বাকচাতুর্য, এমনকী তার রূপেরও অনেক প্রশস্তি শুনে প্রায় ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ছিলাম। তারপর একদিন সেই দিনেশ এসে পৌঁছল কলকাতায়, ১৯৫৪ সালে। আর মনে হলো আমাদের অনেকদিনের জানাশোনা, নিবিড় একটা বন্ধুতা হলো সঙ্গে সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকরকম কথার মধ্যে দিনেশ তখন কেবলই বলত তার ভাইবোনদের গল্প। যখন বলত, চোখেমুখে তার এতটাই স্নেহ উপচে পড়ত যে বুঝতাম কতটাই তার পরিবার-অন্ত প্রাণ। সবচেয়ে বেশি করে বলত তার এক গুণী ভাইয়ের কথা। শুধু স্নেহ নয়, তার বিষয়ে বলতে গিয়ে ওর স্বরে জেগে উঠত একটা শ্রদ্ধাও। বলত, ছোটোবেলা থেকেই সে একজন আদ্যন্ত কমিউনিস্ট কর্মী, ছোটোবেলা থেকেই সে রীতিমতো লেখক। এসব কথা যখন শুনছি তখন সে-ভাইয়ের বয়স আঠারো, কিন্তু কর্মী হিসেবে লেখক হিসেবে যেসব ভাষা তখন ব্যবহার করত দিনেশ, তাতে তাকে মনে হতে পারত পূর্ণবয়স্ক এক মানুষ। হয়নি যে তা, সেটা তার আরেক রকম বর্ণনার ফলে। দিনেশের সেই ভাই দেবেশের নাম যে-মুহূর্তেই মনে পড়ে আমার—আজও পর্যন্ত—তখনই তাকে এক ঝলক দেখতে পাই সেই বর্ণনারই ছবিতে।

'কী রকম দুরন্তপনা করে ও, জানো তো?'—বলেছিল দিনেশ—'ঘোর দুপুরবেলায় হয়তো দেখা গেল ঘরের চালের ওপর দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, স্নানখাওয়া নেই, মা নীচ থেকে বকাবকি করে ডাকছেন স্নানের জন্য, আর ও সঙ্গে সঙ্গে মজা করে আউড়ে যাচ্ছে 'দেশ' পত্রিকায় সদ্যপ্রকাশিত কোনো কবিতার একটা লাইন, হাসছে মাকে শুনিয়ে।'

দেবেশের এই না-দেখা ছবিটাই বারে বারে আমার মনে পড়ে কেন, সেকথা ভেবেছি কখনো কখনো। ওর ওই ছটফটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চঞ্চলতা, কৌতুকোচ্ছলতা, আর সেইসঙ্গে ওর ভিতরকার কবিতাপ্রিয়তা ছাড়াও আরো একটা দিক আমার কাছে ফুটত ওই ছবিতে—ওর পারিবারিকতা। পরে যখন দীর্ঘকাল জুড়ে দেখলাম ওকে সামনাসামনি, তখন মনে হলো এই পরিব্যাপ্ত পারিবারিকতা ওর চরিত্রের একটা বড়ো ধর্ম। সে-পারিবারিকতা নিজেরই পরিবার থেকে শুরু বটে, কিন্তু সেই একই পারিবারিকতায় সে জড়িয়ে নিতে চায়, নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তার পরিচিত মণ্ডলের মধ্যেও। নিকট আত্মবন্ধনে সে-মণ্ডল তো বটেই, তার রাজনীতির কাজও হয়ে উঠতে পারে একটা পারিবারিক বৃত্তে সম্পূর্ণভাবে তাকে মিলিয়ে নেওয়া।

পরের বছরই, ১৯৫৫ সালেই, দেবেশের লেখা নিয়ে দিনেশের অগ্রিম প্রশস্তির যাথার্থ্য টের পাওয়া গেল 'দেশ' পত্রিকার একটি গল্পের মধ্য দিয়ে, 'হাড়কাটা' তার নাম। সেই প্রথম ওর লেখা পড়া। এক কসাইকে নিয়ে লেখা সেই গল্প যে বিষয়গত বিশিষ্টতাতেই মনে ধরেছিল তা নয়, টান দিয়েছিল তার লিখনরীতিও—যে রীতি স্বভাবতই অনেক পাল্টেওছে পরে। অনেকদিন পরে সে-লেখা আরেকবার পড়তে গিয়ে বুঝতে পারি টানটা লেগেছিল কোথায়, কোন্ অনুপুঙ্খের কবিদৃষ্টিতে : 'লোকে বলে পাঠা কাটতে-কাটতে পাঁঠার রক্তও এসে মিশেছে নানকুর চোখে। তাই ওর চোখ এত লাল, কপালের ওপর অজস্র দাগ, মনে হয় একটা কাল আবলুশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছের ওপর একটা বন্য বাঘ শিকার না পেয়ে হিংস্রভাবে থাবা মেরে মেরে গাছটার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করেছে। সর্বাঙ্গের হাড়গুলো কোনোরকম মাংসল প্রতিবন্ধকতা না পেয়ে ওর শরীরটাকে জ্যামিতিক কোণ-উপকোণের একটা উদাহরণমালা তৈরি করে তুলেছে।'

দু-তিন বছরের মধ্যে আরো দুটি স্মরণীয় গল্প লিখে ('আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা' আর 'দুপুর') তখনকার লেখকসমাজের চোখের মণি হয়ে উঠল দেবেশ, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলল ছোটোগল্পে একটা নতুন রীতির আন্দোলন। পরে অবশ্য তার মনে হয়েছিল এ-আন্দোলনে বড়ো কম জিনিস নিয়ে বেশি দাবি করা হয়েছিল। কথনের একটা আধুনিকতা সত্ত্বেও একটা নাটুকেপনার সীমাবদ্ধতা রয়ে গিয়েছিল সেখানে। নিজেকে এগিয়ে নেবার জন্য এই মনে হওয়াটা তার পক্ষে অনিবার্য ছিল, তবে আমাদের মতো পাঠকের কাছে সেই সময়টার থরথরে উত্তেজনাটা স্মরণীয় হয়ে আছে তাজা একটা আবির্ভাবের জন্য, অল্প কিছু পরেই 'নিরস্ত্রীকরণ কেন' বা 'উদ্বাস্তু'র মতো গল্পের জন্য। ততদিনে জেনে গেছি দেবেশ ঘোরতর রাজনীতির মানুষ। কিন্তু রাজনৈতিক গল্প-উপন্যাস বলতে যা বোঝাত তখন, তার সঙ্গে ওর গল্পের কিছুমাত্র মিল নেই। রাজনৈতিক আখ্যানের যে নতুন একটা সংজ্ঞা তৈরি হয়ে উঠবে তার হাতে, তখনও সেটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্মীপুজোর আগের রাতে জলপাইগুড়ি পৌঁছেছি সেবার। শেষ রাতে এল বান। তিস্তার বাঁধ ভেঙে গ্রামশহর ভাসিয়ে দিচ্ছে জল, শহরের উঁচু জায়গাতেও উঠে আছে দশ-বারো ফুট। অনেক প্রাণহানি চারদিকে, আর আমরা একটা দোতলা ঘরে বন্দী হয়ে আছি অনেকে।

দুদিন পরে নামল জল। বাইরের সঙ্গে অন্দর মিলেমিশে গেছে পলিমাটিতে। ত্রাণ ছাড়া খাবার জুটবে না কারো। শিলিগুড়ি থেকে আসতেও শুরু করেছে সেই ত্রাণ। সাধারণ মানুষের তৎপরতায়। কিন্তু বন্ধ হলো তা হঠাৎ। বিশৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে তা আটকে দিল সরকার।

বিশৃঙ্খলা তাতে যে কমল তা নয়। সেই অব্যবস্থার মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম, ত্রাণ প্রসঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে মিলিটারির বন্দুকের সামনে বুকের জামা খুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে দেবেশ, বলছে : 'মারুন এইখানে, যদি সাহস থাকে।' দেবেশ যাকে রাজনৈতিক দৈনন্দিনতা বলে জানে, তার টানেই এই ছুটে যাওয়া, এই বন্দুকের সামনে দাঁড়ানো। একা দেবেশ? হ্যাঁ, সে-মুহূর্তে একাই।

একটা লাইন ভেসে এল মনে। 'ভাবি, একা বাঁধ দেবে? সে কি কখনোই হতে পারে'? আরুণির গল্পটা মনে পড়ল আমার, কদিন পরে যা আকার পাবে একটা কবিতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবেশই সেদিন এনে দিয়েছিল সেই ধুলাশহরে আরুণির ছবি।

১৯৮২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে একবার ঠিক হলো, প্রতি সপ্তাহে ছেলেমেয়েদের সামনে কোনো লেখক এসে কিছু কথা বলবেন তাঁদের সৃষ্টিকাজ নিয়ে। সমালোচকেরা বা অধ্যাপকেরা তো কতই বলেন সেসব কথা। কিন্তু যিনি নিজেই স্রষ্টা, তাঁর কাছ থেকে তাঁর সৃষ্টির ইতিহাস বা সৃষ্টির প্রক্রিয়া জানতে পারাটা নিশ্চয় একেবারে অন্যরকম একটা স্বাদ দিতে পারে? পরিকল্পনাটায় সবারই বেশ উৎসাহ হলো।

প্রথম দিনেই ধরে আনা গেল সমরেশ বসুকে। ক্লাসঘরের মধ্যে আয়োজন। কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারিনি ও-রকম একটা জনবিস্ফার ঘটতে পারে শুধুমাত্র সাহিত্যালোচনা শুনবার জন্য। ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি ভিড়, বারান্দা উপচে পড়ছে, সিঁড়ি জুড়ে পিণ্ড পাকিয়ে আছে নানারকমের মানুষজন।

পরের সপ্তাহেই ডেকেছিলাম দেবেশকে। এবারে যে ঠিক ও-রকম উন্মাদনা হবে না, সেটা জানাই ছিল। নিছক সাহিত্যপিপাসুরাই থাকবে এবার , জনসভা না হয়ে যথার্থ সাহিত্যসভাই এবার হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-ঘরে আলোচনার কথা, তিনটে পর্যন্ত সে ঘরেই আমার ক্লাস। ক্লাসশেষে ছেলেমেয়েরা ওইখানেই অপেক্ষায় থাকবে সেমিনারের জন্য। ক্লাস থেকে বেরিয়ে আমার বসবার ঘরে যাবার পথেই দেখেছি মধ্যবর্তী ঘরে অন্য কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে গল্পে মশগুল দেবেশ। কাছে গিয়ে বলি : 'একটু বোসো, শুরু হবে এখনই।'

কিন্তু কাকে নিয়ে শুরু হবে? নিজের ঘরে পৌঁছতেই খবর পাই, ক্লাসঘর ফাঁকা। বারান্দা জুড়ে কয়েকবার ঘোরাফেরা করতে হলো ছেলেমেয়েদের খোঁজে। কয়েকজনকে ধরে আনতে হলো ক্যান্টিন থেকে। কাজচালানো একটা সমাবেশ হবার পরে দেবেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। অনুদ্বিগ্ন শান্ত স্বরে বলি 'চলো তবে—'

গল্প ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় দেবেশ। আর উঠেই, প্রথম কথা বলে : 'আপনি এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন? আমার কথা শুনতে কি রাশি রাশি লোক জমে যাবে? আমাকে কে চেনে? চলুন তো—'

সবাই মিলে চলতে থাকি ক্লাসঘরের দিকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি তখন স্তম্ভিত। এ-ঘরের পাশ দিয়ে যতবার চলাচল করেছি, একবারও তো সেদিকে মুখ ফেরায়নি দেবেশ। ছেলেমেয়েরা ঘরে আছে কি নেই, এ নিয়ে কেউ তো কোনো কথা বলেনি তার সঙ্গে। আমার উদ্‌বেগ যথাসাধ্য গোপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখবারই তো চেষ্টা করেছি আমি! কী করে তবু সবটাই বুঝতে পারল দেবেশ?

তখনই মনে হলো ওর দৃষ্টিশক্তির কথা। আমরা যতটুকু দেখি, ঠিক ততটুকুই দেখি। কিন্তু একটা বিন্দুর পাশে আরো অনেকগুলি পরিপার্শ্ব একঝলকে দেখতে না পেলে তিনি আর ঔপন্যাসিক হবেন কী করে? আমি ভাবছি নিজেকে গোপন করছি, কিন্তু ঔপন্যাসিকের চোখ দিয়ে সেই গোপনের আচ্ছাদনটুকু ভেঙে অন্তস্তল পর্যন্ত তো দেখে নিচ্ছে দেবেশ!

স্তম্ভিত হবার অবশ্য আরো একটা কারণ ছিল সেদিন। সর্বজনপ্রিয় কোনো কথাশিল্পী নন তখন দেবেশ, তাঁর 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'ও বেরোয়নি তখনও। কিন্তু দু-বছর হলো বেরিয়ে তো গেছে 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'র মতো আশ্চর্য বইখানা, যে-বইয়ের পর তার স্বাতন্ত্র্য আর উচ্চতা বুঝতে ভুল হবার আর কথা নয়। কীভাবে লেখা হলো সেই চ্যারকেটুর কথা, তা জানবার আগ্রহ হবে না ছেলেমেয়েদের?

না, সেকথা অবশ্য সেদিন বলেওনি দেবেশ। নিজের উপন্যাসের বৃত্তান্ত না বলে ঘণ্টাখানেক জুড়ে সে বলেছিল বাংলা উপন্যাসের বৃত্তান্ত। পশ্চিমি একটা আদলকে সামনে রাখার ফলে কীভাবে আমাদের একেবারে নিজস্ব ঘরানার সম্ভাবনাটা লুপ্ত হয়ে গেল ভুল আধুনিকতার মধ্যে, দেবেশ সেদিন বলে গেল তার ইতিহাস। সে কি তবে ভুলে গেল আমাদের ধার্য-করা বিষয়? ভোলেনি বলেই মনে হয়। কেননা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখার বা বিশ্লেষণের ওই ইতিহাসটাই ছিল তার নিজের উপন্যাসচর্চার ইতিহাস। শিল্পে একটা অন্তর্ঘাতের কথা প্রায়ই বলে দেবেশ। নিজেরাই সৃষ্টি-ইতিহাসে সেই অন্তর্ঘাতের একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা দেবার জন্যই—নিজেকে আড়াল করে—পুরোনো অন্তর্ঘাতের চেহারাটাকে সে মেলে ধরলে চেয়েছিল শ্রোতাদের সামনে। এ ছাড়া আর পথ ছিল না তার। নৈর্ব্যক্তিকতার শিল্পাদর্শে অজ্ঞাতবাসটা যেখানে জরুরি, প্রত্যক্ষে থেকেও এ-বর্ণনা তেমনই এক অজ্ঞাতবাস।

সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিল বিভূতি, অভ্র রায়। উচ্ছ্বসিত মন্তব্যে সে বলেছিল সেদিন : এমন একটা ভাষণ শুনতে পাওয়া এক-জীবনের সৌভাগ্য। এ এক অভিজ্ঞতা, এক দিগ্‌দর্শন।

সেও ছিল অনুগামী এক কথাসাহিত্যিক।

AMARBOI.COM

১৯৯৬

সকালবেলায় হঠাৎ একটা ফোন এল। দেবেশের গলা। একটু অনিশ্চিত, একটু থমথমে ভাব। বলল 'রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে না ''আগমন''? এখনই সেটা খুব পড়তে ইচ্ছা করছে, কিন্তু হাতের কাছে পাচ্ছি না।'

'পাঠিয়ে দেব কাউকে দিয়ে?'

'না, না, পাঠাতে হবে না। একবার শুনলেই হবে। একটু পড়ে শোনাবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খেয়া' নয়, 'সঞ্চয়িতা' থেকেই তখন পড়ে শোনাতে থাকি কবিতাটি। অন্ধকার রাত্রে আমরা ভাবছি আসবে না কেউ আজ। দু-একজনে বলেছিল আসবে মহারাজ, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিনি সেটা। শব্দ হলো দরজায়, আমাদের আলস্য তবু কাটে না। দু-একজনে বলেছিল দূত এসেছে, কিন্তু আমরা বলি বাতাস বুঝি হবে। আমাদের সমস্ত অনিশ্চয়তার অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তবু দুয়োরে এসে পৌঁছন দুঃখরাতের রাজা, আমরা তবুও অপ্রস্তুত! 'হায় রে ভাগ্য হায়রে লজ্জা—কোথায় সভা কোথায় সজ্জা!'

পুরো কবিতাটা শুনবার পর দেবেশ এ-কবিতার আবেগসৌন্দর্য নিয়েই দু-চার কথা বলতে লাগল, কিন্তু আমি ভাবছি আজ এই মুহূর্তেই এভাবে এটা ওর শুনতে ইচ্ছে হলো কেন।

সময়টা ছিল দেশের রাজনীতির পক্ষে বলবার মতো একটা সময়। নতুন রকম একটা সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে গোটা দেশ। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম আমাদের গোটা দেশের দায়িত্বভার অর্পিত হতে চলেছে একজন কমিউনিস্ট নেতার ওপর। কিন্তু নিতে পারবেন কি তিনি দায়? দল থেকে সম্মতি কি মিলবে? পুরো মন্ত্রীসভা তো দলের নয়—এমন আংশিকভাবে দায় নিয়ে কি সত্যি সত্যি কোনো কাজে লাগতে পারবেন নেতা? না, দলীয় বিবেচনায় সিদ্ধান্ত হলো, এভাবে নেওয়া যায় না দায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুল হলো কি সিদ্ধান্তটা? এ নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকবে। কেউ কেউ পরে বলবেন, শুধু ভুল নয়, এ এক ঐতিহাসিক ভুল। মস্ত বড়ো সুযোগ এসে দাঁড়িয়েছিল দুয়োরে, দু-একজনে বলেছিল 'দূত এল-বা তবে', কিন্তু 'আমরা হেসে বলেছিলেম, ''বাতাস বুঝি হবে''।'

বুঝতে পারলাম কেন এখনই এ-কবিতা শোনাটা দেবেশের পক্ষে এতটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। 'দূত এল-বা তবে'-র প্রত্যাশা ভেঙে গিয়েছে 'বাতাস বুঝি হবে'র অবিশ্বাসে—এই বেদনার একটা প্রতিচ্ছবি নিশ্চয় সে খুঁজছিল ওই মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে। দেবেশের রাজনীতি কীভাবে প্রতিমুহূর্তেই থাকে কবিতার সঙ্গে বা শিল্পের সঙ্গে জড়ানো, আবার তার কবিতাপড়াও কীভাবে প্রতিমুহূর্তেই জড়িয়ে থাকে তার অনুভূত এক রাজনীতিতে, তার সমস্ত সত্তায়, এক একটা মায়াময় উদাহরণ হয়ে সেই সকালটা স্থায়ী হয়ে থেকে গেল আমার মনে।

২০১০

আগের চেয়ে অনেক কম দেখাশোনা হয় আজকাল, ফোনের সংলাপও কালেভদ্রে। এমন সময়ে, এপ্রিলের মাঝামাঝি একদিন অগ্রিম খবর দিয়ে দেবেশ এসে হাজির। সঙ্গে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নববর্ষে বেরুনো 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল'। হাতে নিয়ে আনন্দে ভরে যায় মন।

যেমন প্রায়ই করে থাকে দেবেশ—বছরের পর বছর ধরে নানা সময়ে নানা জায়গায় ছাপা হতে থাকে কিছু আখ্যান, কার্যত যা একই মহা-আখ্যানের অংশ মাত্র। অংশকে পূর্ণ মনে হতেও কোনো বাধা নেই, পুরোনো অর্থে এ কোনো ধারাবাহিক রচনাপ্রকাশ নয়। অংশ আর পূর্ণ হাত-ধরাধরি করে চলতে চলতে কোনো একটা সমে এসে পৌঁছয়। 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' তেমনি এক মহা-আখ্যান। এর সূচনাসময় থেকেই নানা কারণে আমরা ভরপুর ছিলাম ঔৎসুক্যে—এতদিনে তবে বই হয়ে বেরুল সেটা। হাজার পৃষ্ঠারও বেশি সেই বই। প্রায় চার দশক আগে আমার টেবিল থেকে 'মানুষ খুন করে কেন' নামের উপন্যাসটি হাতে তুলে নিয়ে সন্দীপন বলেছিল 'বই, এত বড়ো হয়?' তার দ্বিগুণেরও বেশি আয়তনের এ-বই দেখলে কী বলত সে!

কিন্তু শুধু সেজন্য নয়, 'মানুষ খুন করে কেন'র কথা মনে পড়ল আরো একটা কারণে। তার আয়তনে আমারও বিস্ময় দেখে দেবেশ বলেছিল তখন : অনেকটা ফেলে দিতে হয়েছে, অনেকবার লিখতে হয়েছে ফিরে ফিরে। অনেক ফেলে দেওয়া? অনেকবার লেখা? এত সময় পায় কখন, এত ধৈর্যই বা পায় কোথায়? পরিবার নিয়ে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে, সাহিত্যজগৎ নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে সবসময়েই তো হৈ হৈ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে চলেছে দেখতে পাই। তার মধ্যে কখন ও করে এত পরিশ্রম? এর মধ্যে প্রায় একটা অলৌকিকতা আছে। 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' বিষয়েও একটু লাজুকভাবে বলে : 'আরো বড়ো হবার কথা, কিন্তু থামিয়ে দিতে হলো।' তার মানে, একেবারে শেষাংশে যেন লেখকেরই নভেল ত্যাগ, যেন বলে ওঠা ঢের হয়েছে, আর নয়। এত পরিশ্রমের মধ্যে একটা খেলাচ্ছলও আছে ওর।

এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিক ওই মহাগ্রন্থের পূর্ণ সমাদর হতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না, আমাদের স্বাধীনতা-ইতিহাস-পর্বের সমস্ত এক উপেক্ষিত অধ্যায় গাঁথা হয়ে আছে এখানে। যাঁরা শুধু ইতিহাসচর্চাই করেন, তাঁদেরও পুরো মন আজও নিবিষ্ট হয়নি এই অধ্যায়ের দিকে। সেই অধ্যায় থেকে, এখানেও আছে ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এক 'অপর'-এর সন্ধান। 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' বা 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র 'অপর' থেকে তা স্বতন্ত্র, তবু সংযুক্ত। অনেকদিন আগে দেবেশ বলেছিল : 'একজন ঔপন্যাসিক লিখতে চাইছে ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা। ব্যক্তির ইতিহাস মানে ব্যক্তির জীবন নয়। সেই জীবন যে-ইতিহাসের অংশ সেই ইতিহাসে সেই ব্যক্তিকে স্থাপন করাই উপন্যাসের কাজ।' সেই কাজটাই আছে তার এখনও পর্যন্ত শেষ এই মহা-উপন্যাসে, যার শেষ কটা লাইন হলো : 'যোগেন নিজেকে দেখতে চায়, ভারতবর্ষ নামে হাজার-হাজার বছরের ধ্যানের একমাত্র প্রতিনিধি সে, এক শূদ্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেছে পাকিস্তানে। সেই ধ্যানের স্বদেশকে সত্য রাখতে। / শূদ্র ছাড়া সে-দায় আর কে নেবে?'

তার পুরোনো বৃত্তান্তগুলির সঙ্গে এইভাবে মিলে যায় যোগেন মণ্ডলের বৃত্তান্তও, আর উপন্যাসের এই শেষ বাক্য আমাদের এগিয়ে নিতে চায় ভাবীকালের কোনো ভারতস্বপ্নে।

সেই স্বপ্ন হাতে তুলে দিয়ে দেবেশ বিদায় নিয়েছিল সেদিন।

২০১৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘কৃত্তিবাস’-এর টানাপোড়েন

সুনীলেরই লেখা কয়েকখানা পুরোনো চিঠি নিয়ে বসেছি আজ, মৃত্যুর পর জীবনের তাপ পাওয়ার জন্য। প্রায় ষাট বছরের সম্পর্কসূত্রে অনেকবারই ঘটেছে চিঠির দেওয়া-নেওয়া, তার সবকিছু যে হাতের সামনে গোছানো আছে তা নয়। তবু, সামনে-পেয়ে-যাওয়া অল্প কয়েকখানা চিঠির ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ফিরে পাচ্ছি পুরোনো দিনগুলির উষ্ণতা। সে-উষ্ণতা কেবল আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নয়, সে-উষ্ণতা মূলত ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকাটি নিয়ে আকুল এক মানুষের জীবনযাপনের। সে-উষ্ণতা ফেলে-আসা সেই সময়কার এক রক্তিম টানাপোড়েনের, অনিশ্চয়তা থেকে নিশ্চয়তায় কেবলই যাওয়া-আসার। কিছুমাত্রও লেখেন যাঁরা, তাঁদের সবাইকে নিয়ে গড়ে তুলতে হবে এক বন্ধুজগৎ, কবিতা আর জীবন একাকার হয়ে মিলে থাকবে যেখানে—এরকম ভাবনার একটা আবেগ ছিল সুনীলের। চিঠিগুলিতে কেবলই থর্‌থর্‌ করছে সেই আবেগ।

ষাটের দশকের গোড়ায়, ‘কৃত্তিবাস’ বলতেই যে-গোষ্ঠীটিকে বোঝাত, তার সঙ্গে আমার লেখনগত বা যাপনগত কিছুমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিল ছিল না। তবু যে একেবারে এর প্রথম দিন থেকে এখনও-পর্যন্ত-শেষ দিনে এসেও, আমাকে এতটা মান দিতেন সুনীল, সে কেবল এইজন্য যে, গোটা কবিসমাজটাকেই তিনি জানতেন তাঁর আপনজন। চিঠিগুলির মধ্যে থেকে গেছে তার কিছু চিহ্ন।

'সুনীলকে লেখা চিঠি' নামে সম্প্রতি-প্রকাশিত একটি বইতে দেখছি, তেষট্টি সালের বিশে ফেব্রুয়ারির একটা চিঠিতে আমি লিখেছি 'আপনার চিঠির পেছনে এবার যেন একটা রক্তিম উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছি।' কেন হঠাৎ লিখেছিলাম একথা? কী ছিল সেই রক্তিম উত্তেজনা? বারো তারিখে সুনীল লিখেছিলেন তাঁর যোগীপাড়া রোডের বাড়ি থেকে 'যাতায়াতের পথেই আপনার বাড়ি পড়ে, কিন্তু কখনো নামা হয় না। আপনার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে পারলে বোধহয় আমার ভালো হতো। কৃত্তিবাস বার করতে চেয়েছিলাম নিতান্ত স্বার্থগত কারণে, কিন্তু আপনারা বড় বাধা দিচ্ছেন। আমি সম্প্রতি কি কবিতা লিখেছি—সেগুলি আপনাদের পড়াতে চাই, কিন্তু কী করে পড়াবো। বাড়িতে গিয়ে শুনিয়ে আসা বোধহয় অত্যাচারের মতো, তাই কোনো জায়গায় ছাপাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় ছাপবো—সব কাগজই প্রতিরক্ষার কাজে এখনো ব্যাপৃত, এমনকি 'শতভিষা'ও এবার দেখলুম প্রতিরক্ষার কাজে মেতেছেন। সেইজন্যই ভেবেছিলাম সকলের কবিতা নিয়ে বেশ বড় করে কৃত্তিবাস ছাপিয়ে সকলের মুখ দেখাদেখি করা যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ কৃত্তিবাসকে ভেবেছিলাম শারীরিক উপস্থিতিহীন সভাসমিতির মতো।

'বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করা বা আধুনিকতার ধ্বজা তোলা এর কোনোটাতেই আমার মন নেই। আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গ্লানিমুক্ত হয়েছি। কবিতালেখা আমার একমাত্র কাজ—কিন্তু আমার জীবন মরণের সমস্যা নয়। অথবা জীবন এবং মরণ এ দুটোরই কোন সমস্যা নেই। সুতরাং যখন যা খুশী হয় তা খুশীমত ভাষায় লিখে গেলে ক্ষতি কি? দুঃখ কিংবা স্ত্রীলোক কিংবা শিল্পের অমরত্ব এগুলোকে ঠাকুর ঘরে পুজো না করে হাসাহাসি গল্পগুজব করলেই বা আপত্তি কি? আমি এরকম ভেবেছি। বা কেউ যদি এসবের জন্য জীবন পণ করতে চান তাতেও ক্ষতি নেই। যে কোন রকম লেখাতেই সাহিত্যের কিছু না কিছু উপকার হয়, অন্ততঃ কোন লেখাতেই যে কোন রকম ক্ষতি হবে না, শক্তিরা যে হাংরি জেনারেশন করছে সেটা আমি পছন্দ না করলেও কারুর কোন ক্ষতি হবে না জানি, অলোকবাবুরা যে কবিতার শুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করছেন তাতেও কোন ক্ষতি নেই, আপনার নীরবতায়ও কোন ক্ষতি হবে না বরং ব্যক্তিগতভাবে আপনার লাভই হতে পারে।

'যাই হোক, কৃত্তিবাস আমার দ্বারা আর বার করা সম্ভব হবে না। আমার ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে। এ কাজ আমাকে আর মানাচ্ছে না। কয়েকজন ইতিমধ্যে লেখা দিয়েছেন—তাই একটা সংখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার করতেই হবে। আমার সম্পাদনায় এটাই কৃত্তিবাসের অবশ্যম্ভাবী শেষ সংখ্যা। অন্য কেউ যদি কৃত্তিবাস বার করতে চান তাঁকে আমি সাহায্য করতে পারি—কিন্তু আমার উদ্যোগে এই-ই শেষ। সুতরাং অবিলম্বে কয়েকটি লেখা পাঠিয়ে দিন। ভালোবাসা নেবেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।'

ওঁরই সম্পাদনায় ষাট বছরে পৌঁছতে চলেছে যে 'কৃত্তিবাস', তার সঙ্গে জড়িত আজকের যুবক-যুবতীরা নিশ্চই বিস্মিত হবেন এই জেনে যে, দশ বছরে পৌঁছেই সম্পাদক ঘোষণা করছেন, 'কৃত্তিবাস আমার দ্বারা আর বার করা সম্ভব হবে না। আমার ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে। এ কাজে আমাকে আর মানাচ্ছে না।' কেন এতটাই বেমানান মনে হচ্ছিল নিজেকে, সেই ১৯৬৩ সালের গোড়াতেই?

হাংরি জেনারেশন নামে একটি আন্দোলনের সূচনা হতে চলেছে তখন, প্রথমটায় সুনীলকে খানিকটা অন্ধকারে রেখেই। তারপর ভাবনাচিন্তা অল্পকিছু এগোবার পর সমীর-মলয় চাইছেন সে-আন্দোলনের সঙ্গে ওঁকেও জড়িয়ে নিতে। সে-বিষয়ে অনিচ্ছুক সুনীলের কাছ থেকে কবিতা চেয়ে সমীর রায়চৌধুরী তাঁকে লিখছেন যে, এ-আন্দোলনের 'স্রষ্টা, নেতৃত্ব এইসব শব্দগুলো প্রত্যাহার করে নেবার জন্য মলয়কে জানিয়েছি', আর মলয় সন্দেহ করছেন 'হয়তো শক্তিদা জড়িত থাকায় আপনি লিখতে চাইছেন না দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকায়।' 'জেব্রা' নামে নতুন একটা পত্রিকার কথাও না কি ভাবছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন শক্তিরা। কোথাও কি একটা দলাদলির সূচনা হচ্ছে তবে? পারস্পরিক ভুল-বোঝাবুঝির?

অন্যদিকে আছে আবার কবিতায় শুদ্ধতার জগৎ নিয়ে প্রতিমুখিতা, 'শতভিষা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যার বিকাশ আলোক-অলোকের চর্চায়, যদিও চিঠিতে কেবল অলোকরঞ্জনেরই কথা লিখেছেন সুনীল। চীন-ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষ শুরু হয়েছে কয়েকমাস আগেই, গোটা দেশ তা নিয়ে উদ্‌বেল আর স্বভাবতই সে-উদ্‌বেলতার চিহ্ন ছড়িয়ে পড়েছে লেখারও জগতে। তাতেও স্বস্তি বোধ করেন না সুনীল। সব কাগজই—এমনকী 'শতভিষা'ও যে 'প্রতিরক্ষার কাজে মেতেছেন' সেটা পছন্দ হচ্ছে না তাঁর। সমস্ত বিরোধ সমস্ত সংঘাত থেকে দূরে সরতে চাইছে মন। তাই ভাবছেন এই সংখ্যাই হবে 'কৃত্তিবাস'-এর শেষ সংখ্যা। পাশে থেকে ভরসা দিচ্ছেন কেবল সমীর 'কৃত্তিবাসের জন্যও তোর যে আদর্শ, তাকেই ধরে রাখতে হবে তোকে, আশেপাশের কারো কারো চিৎকারে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। কৃত্তিবাস আমরা বের করে যাবোই।'

আর, একেবারে অবশ্যম্ভাবী শেষ সংখ্যা হিসেবে নিভৃত ঘোষণা করে যে-পত্রিকাটি বেরোল এর পরে, সেইটেই কিন্তু হয়ে উঠল 'কৃত্তিবাস'-এর একেবারে আলোড়ন-তৈরি-করা সংখ্যা। ছাতার তলায় ফুটপাথে ঘুমোচ্ছে এক বিকলাঙ্গ কিশোরী, গিন্‌সবার্গ-এর তোলা এই ছবি ছিল সে-সংখ্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদপট। কিন্তু সেইসঙ্গে কেন যে ভিতরে ছিল ছোট্ট একটা সম্পাদকীয় নিবেদন, তা বুঝতে গেলে বোধহয় এসব চিঠির পটভূমিটা দরকার হয়ে পড়ে। সে-নিবেদনে ছিল চার লাইনের একটি সংস্কৃত শ্লোক মাত্র, যার সূচনা 'অজ্ঞানাদ্ বা প্রমদাদ্ বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য।/যন্ন্যূনমতিরিক্তং বা তৎ সর্বং ক্ষান্তমর্হসি।।' স্তবকের শেষ কথাটা ছিল 'ক্ষন্তব্যময়মঞ্জলিঃ'। কোন ব্যথা থেকে যে এত বিদায়-ইঙ্গিতবহ ক্ষমাপ্রার্থনা, ওপরের চিঠিটি থেকে তার আভাস হয়তো পাওয়া যায়, পাওয়া যায় ভুল বোঝাবুঝির কিছু আভাস। ও-চিঠি স্পষ্টতই একটা অভিমানের চিঠি। যাঁদের ওপর তিনি ভরসা করে আছেন, একটু-একটু করে তাঁরা সবাই দূরবর্তী এমনকী বিপরীতপন্থী হয়ে যাচ্ছেন হয়তো-বা, এই অভিমান। তবে কি তাঁরই কোনো দোষ হল? না জেনে কোনো অন্যায় করলেন কি তিনি? তা যদি হয়, 'ক্ষন্তব্যময়মঞ্জলিঃ'। কিন্তু এসবের পরেও, চিঠির শেষ লাইনটা হল, 'সুতরাং অবিলম্বে দ্রুত কয়েকটি লেখা পাঠিয়ে দিন।' সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েওছিলাম অবশ্য পাঁচটি টুকরো, যার একটির শুরুতে ছিল এই কয়েকটা শব্দ 'এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়।'

বেরিয়ে গেল সেই ষোড়শ সংখ্যা। অভিমান ভুলে তারও পরের সংখ্যার জন্য আবারও দেখা দিল উদ্যম। আলোড়ন তৈরি করলেও সংখ্যাটা তাঁর মনোমতো হতে পারেনি (কখনোই কি তা পারে?), তাই আরো একবার বার করা চাই, এখনই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখছেন জুলাই মাসের পাঁচ তারিখে : 'কৃত্তিবাস আগের সংখ্যা কেমন হয়েছিল, আপনার মতামত জানতে পারিনি। আমার ভালো লাগেনি। অনেক জিনিসই আর কিছুদিন পর ভালো লাগে না। যাই হোক, গ্লানিমুক্ত হবার উপায় আর একটি সংখ্যা বার করা। বার করছি। জুলাইয়ের শেষে বা অগাস্টের শুরুতেই বেরিয়ে যাবে—আপনার লেখা অবিলম্বে চাই। এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়, আশ্চর্য, তবু কৃত্তিবাস আবার বেরুবে কেন? ঠিক বুঝতে পারছি না। এ সংখ্যাটি দেখা যাক্। আপনার লেখা কবে পাব জানতে পারলে একদিন বাস থেকে নেমে আপনার বাড়ি থেকেও নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে আসার অসুবিধেও আছে একটা। তাড়াতাড়ি একটা চিঠি দেবেন। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নেবেন আমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৫/৭/৬৩'।

যদি ভেঙেই যায় সঙ্ঘ, তবু 'কৃত্তিবাস' আবার বেরুবে কেন, চিঠির ওই সংশয়বাক্যের উত্তরে বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই জানিয়েছিলাম তখন 'না, কৃত্তিবাস কেন বেরুবে না! সঙ্ঘ ভেঙে যায় কিন্তু সমষ্টি তো থাকে। এখন কৃত্তিবাস সমষ্টির পত্রিকা হবে এই মনে হচ্ছিল।' বেরুল সেই সংখ্যাও। অগাস্টের শুরুতেই নয়, বেরুল সেপ্টেম্বরে, আর তার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বেশ প্রত্যয় নিয়েই লেখা হল 'কি জানি ভেঙে যাবে কিনা, হয়তো ভাঙতে সুরু করেছে। কবিতা ও শিল্প যাদের কাছে যীশুর মদ ও রুটি—তারা কোনোদিন থামবে না, হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদক বা দফ্‌তরী বদল হবে, কৃত্তিবাস কোনোদিন ভাঙবে না মনে হয়।' আর একথা বলবার ঠিক পরেই সুনীল চলে গেলেন আয়ওয়ায়, 'কৃত্তিবাস'-এর ঘোষণা অনুযায়ী 'আধুনিক বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদগুচ্ছ প্রকাশে সাহায্য করতে আহূত হয়ে।' শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বেরুল পত্রিকার অষ্টাদশ সংখ্যা।

দেশ থেকে দূরে তখন সুনীল, ভিন্ন কাজে, ভিন্ন পরিবেশে। মে মাসের ঊনবিংশ সংখ্যাটি সেখানে যখন পৌঁছল, কী কথা মনে হল কবিতাকাতর ওই মানুষটির? জুনেই লিখছেন : 'নতুন সংখ্যা কৃত্তিবাস পেলুম, কিন্তু তাতে আপনার লেখা নেই। আপনার লেখা ছাড়া কৃত্তিবাস দেখতে আমার চোখে কি-রকম বে-মানান লাগলো। আগে কখনও এরকম সংখ্যা বেরিয়েছে? মনে তো পড়ে না।

'শরৎ লিখেছেন, অনেক চেষ্টা করেও আপনার লেখা পাওয়া যায়নি। অবশ্য, এত তাড়াতাড়ি কৃত্তিবাস আর কখনও প্রকাশিত হয়নি, সে হিসেবে আপনার প্রতি অবিচারই করা হয়েছে বলা যায়। এছাড়া, আশা করি, কৃত্তিবাসের প্রতি আপনার আর কোনো বিরাগের কারণ ঘটেনি। না, তা করবেন না। প্রতি সংখ্যাতেই অনেক ভুল ত্রুটি থাকে, অনেক কাঁচা উত্তেজনা থেকে যায়—কিন্তু কৃত্তিবাসের মূল উদ্দেশ্য বোধহয় এখনও নষ্ট হয়নি। নাকি হয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না? তাহলে আমাকে বলবেন। বন্ধ করে দেবো। শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচিয়ে রাখার জন্যই কৃত্তিবাস ছাপার কোনো দরকার নেই। বিশেষতঃ ও কাজটা খুব একটা পার্থিব সুখকর কাজও নয়। কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আপনারও বিশেষ দায়িত্ব আছে—আমি সব সময় মনে করি।'

লজ্জিতভাবে এর উত্তরে আমাকে জানাতে হয়, 'আমি যে লিখিনি তার কিন্তু কোনও নৈতিক কারণ নেই। আমি তো খুব সামান্য লিখি এবং আপনি জানেন সময়ে কবিতা পাঠানো প্রায়ই আমার হয়ে ওঠে না। শরৎ খুব তৎপরতার সঙ্গে কাগজ বার করে আমাকে অপ্রস্তুত করেছেন এই মাত্র। অলোকরঞ্জন বলে, কিছু যে লিখতে পারছি না এটা ঘোষণা করে বলবার বিষয় নয়। তা হয়তো হবে। কিন্তু আমার দীনতা আর কিছুতেই গোপনীয় থাকছে না।'

সেই সঙ্গে এও অবশ্য লিখেছিলাম, 'কৃত্তিবাস সব সংখ্যা খুব ভাল হচ্ছে না, হওয়া সম্ভবও নয়, এমনকী তা হবার প্রয়োজনও করে না। কিন্তু এখনও আমার মনে হয় না যে কৃত্তিবাস তুলে দেওয়া উচিত। ...এরকম একটি স্বাভাবিক গোত্রকে স্থির রাখবার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে বেশি।'

সুনীলের ওই চিঠিটির দ্বিতীয়াংশে ছিল আয়ওয়ায় তাঁর দিন কাটানোর বৃত্তান্ত। আর সে-জীবনকে প্রতিতুলনায় রেখে আবারও সেই নিজস্ব কবিবৃত্তে ফিরে আসবার উৎকণ্ঠা : 'আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো নেই। সব সময় একটা অস্বস্তি বোধ করি, যার কারণটা লিখে জানানো যাবে না। বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সংকলন বার করতে হবে—এরকম একটা ভাসাভাসা কথা ছিল আমার আসার ব্যাপারে। সে কাজ আমি একেবারেই করিনি। ইচ্ছে হলো না। কারণ, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই। আমাকে এদেশে আনানো—বা এ বছর সারা পৃথিবী থেকে যে আরও অনেককে আনানো হচ্ছে—সেটি এখানে একটি মাত্র লোক, পল এঙ্গেলের, খামখেয়াল। বাংলা কবিতা ইংরেজি জগতে জানাবার কোনোরূপ ব্যগ্রতা আমি বোধ করলুম না। এরা উৎসাহী হয়ে অনুবাদ করতে চাইলে, আমরা সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আমরা নিজে থেকে উৎসাহী হয়ে অনুবাদ করে—এদের সাহায্য চাইবো—এ ব্যাপারটা আমার কাছে সবসময়ই গ্লানিকর মনে হয়। সে গ্লানি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারলুম না, ফলে এক ধরনের অভিমান কাজ করে মনের মধ্যে, আমি এদের অনেক আধা-সহৃদয় আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছি। কলকাতায় এতে হয়তো অনেকে খুশী হবেন না, আমার বদলে অন্য কেউ এলে এ কাজ করতে পারতো হয়তো। আমি এ কাজের যোগ্য নই, একথা আসবার আগে বুঝতে পারি না—অবশ্য বুঝতে পারলেও যে এখানে আসবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতুম—ততখানি মনের জোর আমার ছিল না নিশ্চিত।

'আমি এক বছর থেকে এখানে কোনো কাজই করলুম না—সে সম্বন্ধে এদের প্রতিক্রিয়া এই—আমি আর একবছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে যাই। টাকা কি অসম্ভব মূল্যহীন—আমি থাকতে রাজি হতে পারিনি। অবশ্য, আমাকে এখানে রাখা একেবারে নিঃস্বার্থ নয় এদের। গত বছর এশিয়া থেকে শুধু আমাকে এনেছিল—এ বছর দশ-বারোজন আনছে---বিদেশ থেকে এত কবি আনছে—এই দেখিয়ে এখানকার ইউনিভার্সিটি নানান্ ফাউণ্ডেশন থেকে প্রচুর টাকা পায় অতিরিক্ত।

'এদেশে এসে আমার প্রধান লাভ হলো এই, আসবার আগে পর্যন্ত পশ্চিম জগৎ সম্বন্ধে যে কাঁচা মোহ ছিল, সেটা কেটে গেল। কলকাতার জনাদশেক বন্ধু ও শত্রুর মুখ চেয়ে কবিতা লেখা ছাড়া ইহজীবনের আর কোনো বড় আনন্দের কাজ নেই বুঝতে পারলুম। এখানে এই একবছরে অলস, বিলাসময় জীবন---হয়তো পরে আমার জীবনে কোনো কাজে লাগবে---কিন্তু আপাতত কোনো প্রকার তৃপ্তি পেলাম না—গলার কাছে বাষ্পের মতো সবসময় একটা অস্বস্তি বা গ্লানি আটকে ছিল।

'আমি এখানে এই ঠিকানায় ১৫ জুলাই পর্যন্ত আছি। তারপর ইওরোপে কিছুদিন কাটিয়ে অগাস্টের শেষে কলকাতা। আপনার ঠিকানা আমার কাছে লেখা ছিল না—মনে করে লিখলুম। যদি এ চিঠি পান—১৫ই জুলাইয়ের আগে অবশ্য একটা প্রাপ্তিসংবাদ দেবেন। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নেবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠিটা যে পেয়েছিলাম সে তো দেখাই যাচ্ছে, এবং তার উত্তরও যদি সুনীলের কাছে না পৌঁছত তবে 'সুনীলকে লেখা চিঠি'র মধ্যে তা আর ছাপা হতো কীভাবে! কিন্তু 'কৃত্তিবাস'-এ কোনো লেখার আহ্বান না জানিয়েই চিঠি শেষ? তা কি কখনো হয় না কি? সেইজন্যই দেখছি এর আরো একটু-অংশে আছে এইরকম 'পুনশ্চ আমার এক বন্ধু একটি স্বপ্নের সংকলন বার করছেন। আপনি জানেন হয়তো। স্বপ্ন লেখা সম্পর্কে আপনার নীতিগত কোনো আপত্তি যদি না থাকে—তবে কয়েকটি স্বপ্ন যতদূর সম্ভব স্মরণ থেকে দ্রুত লিখে কৃত্তিবাসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।'

এটা অবশ্য পাঠাতে পারিনি আমি, পাঠাতে চাইনি বলেই। এমনকী, যতদূর মনে পড়ে, সুনীলকে আমি এও জানিয়েছিলাম যে, এমন কোনো সংকলন না হওয়াই ভালো, কেননা অনেক সময়েই সেটা স্বপ্নরচনা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আয়োজন যে চলছিল, এই চিঠি পাবার আগে 'কৃত্তিবাস'-এরই পাতায় তার বিজ্ঞাপন দেখেছি। সমীর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় পরিকল্পিত সেই সংগ্রহের নাম ভাবা হয়েছিল 'এলাকা ৪৪'।

দেশে ফিরে আসবার পর আবারও দায়িত্ব তুলে নিলেন সম্পাদনার, আবারও লেখার জন্য তাগাদা : 'কৃত্তিবাসের জন্য আপনার লেখা খুব তাড়াতাড়ি চাই। সেই যে প্রবন্ধের কথা বলেছিলেন, অথবা কবিতাবলী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা হয়েছিল, 'কৃত্তিবাস'-এর কবিদের ছন্দব্যবহার নিয়ে আমাকে কিছু লিখতে হবে। কেননা, বুদ্ধদেব বসুর মতো মানুষেরাও তখন বলতে শুরু করেছেন যে, এই তরুণরা ছন্দটা ঠিকমতো জানে না। সত্যিই কি সেটা? তার উত্তর দিতে হবে আমাকে। কিন্তু এই চিঠিটির ভিন্নাংশে ছিল একটা মজার কথা 'এবার কমলকুমার মজুমদারের একটি দীর্ঘরচনা থাকছে, সেটা ছাপা শুরু হয়ে গেছে, সুতরাং কাগজ বেরতে বেশী দেরী হবে না—এগুলো সব সত্যি কথা। এবং আপনার লেখা ছাড়া কৃত্তিবাস বার করার কোনোই মানে হয় না। দশ দিন সময় দিলাম।

'লেখা আনতে আপনার বাড়ি যেতে হবে? এর মধ্যেই একদিন যেতাম। কিন্তু বিলেত ঘুরে এসে আমি খনিকটা সাহেব হয়ে গেছি—মনে হল, আপনার বাড়িতে আমি অনেকবার গেছি, এবার আপনার একবার আসা উচিত আমাদের বাড়িতে—রিটার্ন ভিজিট হিসেবে। অকিঞ্চিৎকর মানুষের পক্ষেও এরকম আশা করা অবৈধ নয়। আপনি নিশ্চয়ই শারীরিক ভালো আছেন। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নেবেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।'

গদ্য নিয়ে নয়, কিন্তু কবিতা নিয়ে সন্ত্রস্তভাবে হাজির হয়েছিলাম যোগীপাড়া রোডের বাড়িতে, এই চিঠির পরে। না গিয়ে কি পারা যায়? আগেকার একটি চিঠিতে ছিল : 'আপনি কৃত্তিবাসের পরের সংখ্যার জন্য লেখা শুরু করবেন? পরের সংখ্যা আগামী মাসেই বেরুচ্ছে এমন মিথ্যে দাবি আর করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই না। কিন্তু আপনার কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করতে কত দেরী লাগে তা তো আমি জানি। আপনার অনেকগুলি কবিতা এবং/বা দীর্ঘ গদ্য রচনা এবার পাবো? আপনি ছন্দ সম্পর্কে লিখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

ছন্দ-বিষয়ের সেই লেখা শেষ পর্যন্ত বেরিয়েছিল তেইশ নম্বর সংকলনে। কিন্তু তার অনেকটা আগেই, একবিংশ সংখ্যা (১৯৬৫), অন্তর্গত প্রতিটি কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে দেওয়া হয়েছিল সূচনায়। এমনকী অন্তর্গত নন যাঁরা, তাঁদেরও। লেখা ছিল : 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সমীর রায়চৌধুরী আমাদের অজ্ঞাত কারণে, কৃত্তিবাসের সঙ্গে আর সহযোগিতা করতে চাইছেন না।' ছিল , 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কি লেখা দেবেন ভাবতে ভাবতেই বেলা কেটে যায়।'

আর অন্তর্গত কবিদের শেষ নামটি ছিল সুনীলের, এইভাবে 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এখন একটু ক্লান্ত।'

সে ছিল ১৯৬৫ সাল। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অভিমানের সেই ক্লান্তি পেরিয়ে এসে আজ এতদিন পরে, জীবনের শেষ ক্লান্তিতে পৌঁছলেন সুনীল! 'কৃত্তিবাস' হয়তো বেরুবে আবার পরে, হয়তো লিখতেও হবে তাতে, কিন্তু সেখানে থাকবে না এত দীর্ঘকালজোড়া সেই প্রীতিভরা প্রতীক্ষা, স্বজনসুলভ সেই একাত্মবোধের গাঢ়তা।

২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীরকম ভাবে বেঁচে ছিলেন

কীরকম ভাবে বেঁচে ছিলেন তিনি, নতুন দিনের পাঠকেরা এখন থেকে তা জানবেন শুধু তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে।

কেমন হতে পারে নতুন দিনের কবিতা, এ নিয়ে তরুণ সুনীলকে একবার কয়েকটা কথা লিখেছিলেন, তাঁর সদ্য-পাওয়া বন্ধু অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ, ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে। 'হাউল' দিয়ে জগৎসংসার মাতিয়ে গিন্‌সবার্গ তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন কলকাতা-বারাণসী, একাকার মিশে গেছেন 'কৃত্তিবাস'-এর কবিদলের সঙ্গে। সেই সময়টায় তিনি লিখছেন সুনীলকে : যা কিছু তুমি অনুভব করো তাকে ঠিক-ঠিক বলে যাওয়াটাই হল কবিতার কাজ, যেখানে থাকবে তোমার সমস্ত রকম স্বীকারোক্তি সমস্ত রকম অসন্তোষ সমস্ত রকম উচ্ছলতা। 'কী তোমার হওয়া উচিত' সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ না রেখে কবিতা আজ জানতে চায় তুমি ঠিক কেমন।

নিজেরই মধ্য থেকে তেমন এক অভিমুখে এগোতে চাইছিলেন সুনীল, তবু এই চিঠিটি বোধ হয় সাহায্য করেছিল তাঁর শেষ দ্বিধাটুকু ভেঙে দিতে। 'একা এবং কয়েকজন'-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি তাই এক ঝটকায় এগিয়ে এলেন 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি'-র বৃত্তান্তে। আর, এই বৃত্তান্ত শুধু যে তাঁর ওই একটিমাত্র বইয়েরই নাম হয়ে রইল তা নয়, এইটেই হয়ে দাঁড়াল তাঁর আদ্যন্ত সমস্ত কবিতার সাধারণ পরিচয়। তাঁর কবিতা তাঁর বেঁচে থাকার ধারাবিবরণ। এমনইভাবে সে-বিবরণ তিনি বলে যান নতুন কালের ভাষায় যে অনেক পাঠকই তাতে দেখতে পান তাঁদেরও আত্মপ্রতিচ্ছবি, নিজে নিজে যা তাঁরা দেখতে পাননি, হয়তো-বা দেখতে চাননি। এইভাবে, আত্মস্বীকারোক্তি দিয়েই সুনীল তৈরি করে তুলতে পেরেছিলেন বড়ো একটা পাঠকসমাজেরও স্বীকারোক্তি।

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি, সেটা দেখতে গেলে কেবল যে আমিটুকুতেই আটকে থাকে মানুষ, তা কিন্তু নয়। আমার সেই বেঁচে থাকার মধ্যে আমার নিজস্ব দৈনন্দিন যেমন আছে, তেমনি তো আছে আমার চারপাশের মানুষজনও, চারপাশের পৃথিবীও। সেও তো আমি-রই অভিজ্ঞতা, আমার বেঁচে থাকারই। তখনই ভূমধ্যসাগরের ওপর থেকে ধাবমান উড়োজাহাজের মধ্যে নিজেরই ক্ষুৎকাতর চিৎকারের পাশাপাশি জেগে উঠতে পারে গোটা জগতের বুভুক্ষুরা, তখনই দেখা যায় 'পিছনে জ্বলন্ত ইউরোপ সামনে ভস্মসাৎ কালো প্রাচ্যদেশ'। তখন চে গুয়েভেরার মৃত্যু এসে অপরাধী করে দিতে পারে আমাকে, তখনই পথের পাশে বসে থাকা অবহেলিতাকে দেখে কারো মনে পড়ে যেতে পারে আপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাইমাকে, স্বভূমির জন্য আবেগভরা ভালোবাসায় তখনই বলা যায় 'যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াব/আমি বিষ পান করে মরে যাব! অথচ সর্বস্ব জড়িয়ে নিয়ে এই দেশটাকে এই পৃথিবীটাকে এমন ভাবে ভালোবাসেন যে মানুষ, অনেক সময়েই খণ্ডভাবে বা ভুল ভাবে তিনিই চিহ্নিত হয়ে যান নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হিসেবে, অতিযৌনতায় কাতর মানুষ হিসেবে, বা নিতান্ত রবীন্দ্রবিদ্বেষী এক কবি হিসেবে।

আলগা আলগা কিছু লাইন সে-ভুলবোঝায় সাহায্য করে অবশ্য, যেমন, এক সময়ে বিস্তর হইহই হল 'তিনজোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী লুটোয় পাপোষে'-র মতো কথাটাকে নিয়ে। 'এ তো ঈশ্বরদ্রোহিতা'—মনে হয়েছিল সে কালে অনেকের। খাটের ওপর ছিল কয়েকখানা বই, ঘটনাচক্রে রবীন্দ্ররচনাবলীই, ঘুমন্ত তিন বন্ধুর পায়ে লেগে সেটাই পড়ে গিয়েছিল মাটিতে, এইটুকু ছিল ঘটনা। কিন্তু এ ঘটনাকেও কবিতায় না আনলে কী ক্ষতি হতো? ক্ষতি কিছুই হতো না, শুধু ঘটনাটা বলা হতো না, পাওয়া যেত না এই ছবিটি। মনে মনে রবীন্দ্রবিদ্বেষ না থাকলে কি ও লাইন লিখতে পারে কেউ? এ প্রশ্ন মনে উঠলে তাঁকে জানিয়ে দিতে হয় এই মানুষটিরই আর একটা উচ্চারণ 'কয়েক দিন ধরে মনটা ভারি আনন্দে ভরে আছে। শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছি।'

তার মানে অবশ্য এ নয় যে কবিতাজগতে রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেকখানি দূরত্ব চাননি এই কবি, বা কবিরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়েছিলেন নিশ্চয়ই, অনেকরকম ভাবেই চেয়েছিলেন সেই দূরত্ব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে সেই দূরত্বটা ছিল কিন্তু 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি'-র বোধের মতোই। একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন 'যেমন-হওয়া-ভালো'র দিকে 'যেমন-হয়ে-থাকে'র চলার কথা। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনবোধ আর সাহিত্যবোধ নির্ভর করে ছিল এই চলনটার উপর। আর ঠিক এর বিপরীতেই ছিল গিন্‌সবার্গের সেই পরামর্শ যে 'What should be' leads one astray। সেই বিপরীতেই সুনীলের সমস্ত জীবনের 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি'র দলিল। তাই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে কয়েক দিন ধরে মনটা ভালো থাকলেও সৃষ্টিমুহূর্তে তাঁকে অনেক দূরবর্তী হয়ে যেতে হয় সেই জগৎ থেকে।

দূরবর্তী সেই জগতে, ছোটোমাসির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে গিয়ে প্রথম যৌন আনন্দ পাওয়ার বয়ঃসন্ধিশোভন নিতান্ত স্বাভাবিক এক অনুভবের কথা বলতে গিয়ে এক দিন কত-না ধিক্‌কৃত হতে হলো এ-কবিকে। সন্দেহ নেই যে তীব্র যৌনতা তাঁর কবিতার অন্যতম বড়ো ভর। কিন্তু সেইখানেই যে থেমে থাকে না সেটা, এর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যে এক ব্যাপ্তমদির ভালোবাসার জগতে পৌঁছে দেন তাঁর কবিতাকে, সেটা অনেক সময়ে ভুলে থাকি আমরা, ভুলে থাকি এক কাতর করুণ প্রেমিকের আর্ত মুখচ্ছবি। যেখানে গিয়ে বলা যায় 'আয় খুকি, স্বর্গের বাগানে আজ ছুটোছুটি করি', ভালোবাসা সুনীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই স্বর্গের বাগান। নীরার প্রেমিক হিসেবেই তাঁর জনপ্রিয় পরিচয়, এবং মিথ্যে নয় সে-পরিচয়। কিন্তু শুধুই নীরা নয়, শুধুই নারী নয়, সুনীলের কবিতায় ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে দেশের প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য। যেমন ব্যক্তিজীবনে, তেমনই কবিতায়, এই ভালোবাসাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো শক্তি, বড়ো পরিচয়। কোনো গণ্ডিবদ্ধ ভালোবাসা নয়, সর্বাত্মক সর্বভুক ভালোবাসা।

আর এই ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে যে ভাষা সুনীল ব্যবহার করেন, যে ভঙ্গি, তাতে একটু একটু করে মুছে আসে কবিতার সঙ্গে গদ্যজগতের দূরত্ব। এই দূরত্বটাকে একেবারে সরিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর কবিজীবনের প্রধান এক কাজ। আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার নিভৃত এক দুপুরে কোনো বন্ধুজনের কাছে তিনি বলছিলেন নতুন কবিতার পথসন্ধানের কথা। আমেরিকার আয়ওয়া শহরের এক বছরের প্রবাসজীবন ছেড়ে ফিরে এসেছেন তখন, গাঢ় পরিচয় ঘটেছে সমকালীন বিশ্বকবিতার সঙ্গে। বলছিলেন, তখন, লিরিকের পথ আর আমাদের পথ নয়, ভিন্ন এক গদ্যপন্থায় চলবে আজ কবিতা। অন্তত তাঁর নিজের কবিতা সেই পথ ধরে চলতে চেয়েছে তখন থেকে, অতিরহস্যের মায়াজাল ছেড়ে দিয়ে।

গদ্যপদ্য একাকার হয়ে যায়, যাপন আর সৃষ্টি একাকার হয়ে যায়, জেগে থাকে শুধু এক স্বচ্ছমূর্তি, স্বাভাবিক চেহারায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর জীবনগত আচরণের স্বচ্ছন্দতা আর স্বতঃস্ফূর্তি চিহ্ন রেখে যায় তাঁর কবিতায় কিংবা তাঁর প্রবহমান গদ্যে। এই সবকিছুই পাঠকের সামনে বইতে থাকে যেন সাবলীল এক জলধারার মতো। একদিন সে জলের ছিল পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার তোড়, তারপর আস্তে আস্তে মৃদুতার দিকে এগিয়ে আসে স্রোত। তীক্ষ্ণ ব্যথা হয়ে ওঠে গহন বেদনা।

সেই বেদনা নিয়ে আজ চলে যান সব-কিছু-দেখতে-চাওয়া সব-কিছু-ছুঁতে-চাওয়া প্রেমময় এক মানুষ। ভালোবাসার হিরের গয়না নিয়ে জন্মেছিলেন যিনি, তাঁর আকস্মিক এই চলে যাওয়া যেন পাখির চোখে বালুকণারও অসামান্যতা দেখতে দেখতে চলে যাওয়া। যমুনার হাত ধরে স্বর্গের বাগানে এখন তাঁর ছুটোছুটির সময়।

২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ সুনীল

এই সময় দীর্ঘদিনের পরিচিত কোনও নিকটজন হঠাৎ মারা গেলে বহু কথা যেন ছবির মতো একের পর এক ভেসে ওঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই আকস্মিক মৃত্যুর পর আপনারও নিশ্চয়ই তাই হচ্ছে...

শঙ্খ ঘোষ : এ সময় আর কী-ই-বা বলবার আছে। পরিচয় সেই ১৯৫৩ সাল থেকে। অজস্র ঘটনার, অনেক সাধারণ মুহূর্তের কথাও মনে পড়ছে। কতটুকুই-বা আর বলা যায়।

আপনার থেকে কি বয়সে বড়ো ছিলেন?

ছোটো। আমার থেকে বছর দুয়েকের ছোটো।

আজ এই মুহূর্তে কী মনে পড়ছে?

আমি যে সুনীলকে দেখেছি তাঁর একটা মহত্ত্বের দিক ছিল অন্যদের ভালোবাসার ক্ষমতা এবং সম্পূর্ণ বিপরীত মতের প্রতিও একটা শ্রদ্ধাশীল সহিষ্ণুতা। সব সময়েই চাইতেন, একটা কবিতার পরিবার নিয়ে থাকতে। সবাই লিখবে। চারপাশে একটা আনন্দময় কবিতার জগৎ তাঁকে ঘিরে থাকবে। একজন লেখক কোন ঘরানার বা 'কৃত্তিবাস'কে কেন্দ্র করে তাঁদের কয়েকজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে একটা বিশেষ গোষ্ঠী ছিল তার সঙ্গে কোন কবির কতটা যোগাযোগ এটা সুনীলের কাছে কখনোই খুব বড়ো ব্যাপার ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে কয়েকটা খুবই ছোটোখাটো ঘটনার কথা বললেই সেটা বোঝা যাবে!

যেমন? ...দু-একটা বলুন।

১৯৬০ সালের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমার প্রথম কবিতার বই বেরোনোর পর বছরচারেক আমি খুবই কম লিখতাম এবং আরো কম প্রকাশ করতাম। এই সময়ে হঠাৎ একদিন সুনীলের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। একটা পোস্টকার্ড। উনি লিখেছেন, 'শুনেছি আপনি বাড়ি পেয়েছেন। এ বার তবে কবিতার দিকে মন দিন।' আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। সত্যিই সে সময় বাড়ি নিয়ে নানা সমস্যায় ছিলাম। তবে তার সঙ্গে কম কবিতা লেখার কোনোই সম্পর্ক ছিল না। সুনীলের অনুমান ভুল ছিল। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়, আমি অবাক হয়েছিলাম কবিতার প্রতি তাঁর মমতা দেখে। আমি তো কখনোই ওঁর সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলাম না। ওঁর খবর রাখার কোনো কারণই ছিল না যে আমি লিখছি কি লিখছি না, কিন্তু উনি খবর রাখতেন এবং সত্যিই চাইছিলেন যে আমি কবিতালেখায় ফিরে আসি। এই মনটা ওঁর আজীবন অটুট ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই। একটা ঘটনা মনে পড়ছে যাতে বুঝতে পেরেছিলাম সুনীল কত খোলা মনের মানুষ ছিলেন এবং বিরোধী মত বা চিন্তার প্রতি কখনো কোনো বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। সেটা ১৯৬৬ সাল। একবার 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকায় সুনীল একটা কবিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। এরপর ওই পত্রিকাতেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সুনীলের লেখার তীব্র প্রতিবাদ করে একটা লেখা লেখেন, যার মূল কথা ছিল সুনীল লেখাটার কিছুই বোঝেননি। সুনীল আবার এর একটা চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন। যাই হোক, ঠিক এর দিন কয়েক পরে পড়তি দুপুরে আমারই বাড়িতে আমি আর অলোকরঞ্জন গল্প করছি, হঠাৎ সুনীল এসে হাজির। অলোকরঞ্জন একটু অপ্রস্তুত। আমার মনেও একটা আশঙ্কাভাব। কয়েকদিন আগেই দুজনের মধ্যে একটা বেশ ধারালো বাদানুবাদ হয়ে গেছে। এখন কী হবে? শেষে অলোকরঞ্জন বললেন, 'আপনার লেখাটা পড়লাম।' সুনীল আশ্চর্য সহজ ভাবে হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 'বেশ তো, এবার তাহলে এরও জবাব লিখুন!' নিমেষে পরিবেশটা সহজ হয়ে গেল। এরপর তিনজনে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা চলল। বা, এই তো মাত্র কয়েক বছর আগেকার একটা কথা। সুনীলের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরে আমি একটি লেখায় ওই কাজের বিস্তর প্রশংসা করলেও দুটো বিষয়ে গুরুতর আপত্তি তুলেছিলাম। এরপর সুনীল একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন করে জানালেন, 'লেখাটা পড়ে আমি মুগ্ধ।' আমি ওঁকে মনে করিয়ে দিলাম আমার আপত্তিগুলোর কথা। উনি বললেন, 'না না। সে ঠিক আছে। সে বিষয়ে নিশ্চয় ভাবব। কিন্তু লেখাটা অসাধারণ।' আজকের এই সাহিত্যসমাজে থেকেও সুনীলই বোধহয় একমাত্র মানুষ যিনি কখনো কারো নিন্দে করেননি। এমনকী আড্ডার সময়েও অন্য কেউ কারো নিন্দেমন্দ করলে তাঁকে থামিয়ে দিতেন। সুনীল যেমন সব সময়েই অকুণ্ঠভাবে নিজের মত প্রকাশ করেছেন, তেমনই অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ গুণটা আমি মনে করি দুর্লভ। অন্য একটা অতি তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ছে। বহুকাল আগে। আমি তখন শ্যামবাজারে থাকি। রাত্রি নটারও বেশি হয়ে গেছে। আমরা সপরিবারে খেতে বসেছি। মনে আছে খিচুড়ি হয়েছিল সেদিন। এমন সময়ে ঘন্টি বাজল। দরজা খুলে দেখি সুনীল। ওঁর আসার কোনো কথাই ছিল না। কী করি। খানিকটা সৌজন্যের খাতিরেই বললাম, 'আমরা খেতে বসেছি। আপনিও আসুন না।' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরকম পরিস্থিতিতে অতিথি ভদ্রভাবে কিছু একটা বলে অনুরোধ এড়িয়ে যান। সুনীল একটুও কুণ্ঠা না করে আমাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। একসঙ্গে খেতে খেতে আমাদের কথাবার্তা চলতে থাকল। আরেকটা দিনের কথা মনে আছে ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে এক বন্ধুর মা আমায় জানালেন সমরেশ বসু তাঁর একটি বই আমায় উৎসর্গ করেছেন। ভারি অবাক হলাম। বন্ধুকে বললাম ইনি নিশ্চয়ই অন্য কোনো শঙ্খ ঘোষ। যদিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বন্ধুটি এবং তাঁর মা নিশ্চিত যে বইটি আমাকেই উৎসর্গ করা। শেষমেশ সমরেশবাবুকে একটা চিঠিই লিখে ফেললাম। তাতে জানালাম যে শঙ্খ ঘোষ নামে আরো একজন আছে জেনে আমি চমৎকৃত বোধ করছি। উনি তার উত্তরে জানালেন অন্য কোনো শঙ্খ ঘোষ নয়, বইটি আমাকেই উৎসর্গ করা। বইটি আমার হাতে নিজে দিতে না পারার জন্য সেই চিঠিতে তিনি দুঃখপ্রকাশও করেছিলেন। এটা হতেই পারে। উনি নৈহাটিতে থাকতেন। আমাদের যে প্রায়শই দেখা হতো তা-ও নয়। হয়তো প্রকাশক বা কাউকে সে-দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তা পালন করেননি। আমি একেবারেই কিছু মনে করিনি এ নিয়ে। মজার কথা হলো, এর বছর কয়েক পরে একদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের ঘরে আছি। তখন সুনীল খ্যাতির চুড়োয়। তাঁর একাধিক গদ্যলেখা তখন খুবই জনপ্রিয়। হঠাৎ একটা সোরগোল— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছেন। উনি সোজা আমার ঘরে হাজির হয়ে আমার হাতে একটা বই দিয়ে বললেন : 'আপনাকে উৎসর্গ করেছি। তাই আপনার হাতে দিতে এলাম।'

কবিতা দিয়ে শুরু করলেও সুনীলবাবু পরে বহু গল্প উপন্যাস লিখেছেন। সেসব লিখে বিপুল খ্যাতিও অর্জন করেছেন। ওঁর গদ্যের কোনো বিশেষ দিক নিয়ে কিছু বলবেন ?

সুনীল-চরিত্রের সহজতা ছড়িয়ে আছে ওঁর লেখার মধ্যেও। ওঁর গদ্যের এই স্বতঃস্ফূর্তি, এই সাবলীলতা আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষভাবে টানে। অনেক বছর আগে ওঁর লেখা একটা বই আমার হাতে দিয়ে বেশ প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন, 'এটা আপনার ভালো লাগবে।' শুনে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। একটা ফরাসি প্রেমের লেজেন্ডকে উনি বাংলা কাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। নাম 'সোনালী দুঃখ।' সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল। আজকাল সে-বইয়ের কথা আর শুনি না। পাওয়া যায় কি? তা ছাড়া, যেটা ওঁর গদ্য লেখা পড়লে অনেকসময়েই চট করে বোঝা যায় না, তা হলো প্রায় প্রত্যেক লেখার পিছনেই—বিশেষ করে ইতিহাসভিত্তিক লেখাগুলির পিছনে—প্রচুর পড়াশোনা, গবেষণা আছে। হেলাফেলা করে লিখতেন না। অধিকাংশ লেখার পিছনে একটা বিরাট প্রস্তুতির ব্যাপার থাকত।

আর ওঁর কবিতা?

ওঁর কবিতার বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তা স্বতঃস্ফূর্ত, আত্মজৈবনিক এবং গদ্যপন্থী। লিরিকাল ধারা ছেড়ে দিয়ে বাংলা কবিতাকে গদ্যধর্মিতার দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ওঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা পরবর্তী সময়ের বহু কবিকে প্রভাবিত করেছে। মনে আছে, ১৯৬৬ সালে উনি আমাকে একবার বলেছিলেন, 'কবিতায় লিরিক আর আজকাল চলে না। বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ ভিন্ন পথে।' টানটান গদ্যধর্মিতাকেই সুনীল কবিতার আধুনিকতা বলে মনে করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইদানীং উনি একটা দৈনিক পত্রিকায় একটা কলাম লিখছিলেন তার যে নামটা দিয়েছিলেন...

'যা দেখি, যা শুনি, একা একা কথা বলি'।

ঠিক। এইটাই আসলে সুনীলের সারা জীবনের কবিতার মূল চরিত্র বলে আমি মনে করি। গদ্যের থেকেও হয়তো পরবর্তী প্রজন্ম ওঁকে কবিতার জন্যেই বেশি মনে রাখবে। অসামান্য সব ছোটোগল্পও লিখেছিলেন।

পরবর্তীকালে উনি কি খানিকটা কবিতা থেকে সরে গিয়েছিলেন?

অনেকেরই এরকম একটা ধারণা আছে। অনেকেই মনে করেন যে গদ্যে খ্যাতি পাওয়ার পর থেকে সুনীল কবিতা থেকে সরে এসেছিলেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কবিতা ওঁর কাছে খুব বড়ো ব্যাপার ছিল। মনে আছে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে উনি একটা প্রবন্ধে আক্ষেপ করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কোনো তরুণ কবি কিছুই তেমন লেখেননি। পড়ে অবাক হলাম। আমি আর অলোকরঞ্জন তখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি করেছি। ভুলটা ভাঙল পরের লাইনটা পড়ে। সেটা ছিল এরকম : দু-একজন লিখেছেন, কিন্তু কবি হিসেবে নয়, অধ্যাপক হিসেবে। সত্যিই লেখাগুলো—যাকে বলে অ্যাকাডেমিক—সে-রকম লেখা ছিল। সুনীল হয়তো কখনো কখনো কবিতা কিছু কম লিখেছেন। কিন্তু কবিতাকে কখনো ছেড়ে যাননি। বরং বিশেষ করে শেষ পনেরো বছর তুমুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবে কবিতার মধ্যে ফিরে এসেছিলেন। কবিতা না লিখলে স্বস্তি পেতেন না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারার জন্য ওঁর একটা পরিচিতি ছিল। অথচ বিপুল পরিমাণ লিখেছেন। যাকে বলে প্রলিফিক রাইটার। এটা কী করে হয়...

সে কী, সকলেই শুধু ওঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারার কথাই জানেন? একটা বিষয় অনেকে খেয়াল করেন না, এই যে তিনি এত বিপুল পরিমাণ লেখা লিখে গেছেন ভেতরে ভেতরে একটা কঠোর শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। বছরের পর বছর ধরে প্রত্যেক দিন সকালবেলা কয়েক ঘণ্টা টেবিলে কাটানো খুব সহজ কথা নয়।

AMARBOI.COM

সুনীলবাবুকে কিন্তু অনেক ব্যক্তিগত আক্রমণও সইতে হয়েছে নানা কারণে...

হ্যাঁ, বহুজনকেই দেখেছি ওঁর বিষয়ে কিছুই না জেনে ওঁকে আক্রমণ করতে। দশ-বারো বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমি একটা প্রদর্শনীতে গেছি। সুনীলও গেছেন। আমাদের কিছু বলার কথা ছিল না। মূল বক্তা ছিলেন অন্য একজন। হঠাৎ তিনি বলে বসলেন বিদেশে লেখকশিল্পীরা বহু দানধ্যান করেন, অনেকের উপকার করেন, অথচ আমাদের এখানে যেসব লেখক-শিল্পী অনেক উপার্জন করেন, তাঁরা তেমন কাজ করেন না। তাঁরা নাকি নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও তিনি কারো নাম উল্লেখ করেননি তবু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাঁর এই বক্তব্যের লক্ষ্য সুনীল। কিছু বলার আয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সুনীল তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদ করে কিছু কথা বলেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি পাশে-বসা একজনের নাম করে সেই বক্তার কছে জানতে চান বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দানের খবর উনি রাখেন কি না। সুনীল কিন্তু একবারও সেদিন উল্লেখ করেননি যে তিনি নিজে সারা জীবন কত মানুষের উপকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে পরে আমি সেই বক্তাকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম সুনীল সর্ব অর্থেই কত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেক দুঃস্থ মানুষও আছেন। কাজেই সুনীলের চলে যাওয়ায় বহু মানুষ নানাভাবে নিরাশ্রয় বোধ করবেন। এই আশ্রয়হীনতা কেবল আর্থিকই নয়, আত্মিকও।

২০১২

'এই সময়' পত্রিকার পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন নীলাঞ্জন হাজরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ সুনীল

তাঁদের মতানৈক্য নিয়ে কয়েকবার শোরগোল পড়েছে চারপাশে। কাব্যধারা থেকে রাজনীতি—এক আপাতদূরত্বই চিহ্নিত করেছে দুজনকে। আর সেই চিহ্নিত ভূমির ঠিক নীচেই লুকনো নদীর মতো বরাবর বয়ে চলেছে তাঁদের নিবিড়, নিভৃত বন্ধুত্বের জলরাশি। পরমার সঙ্গে আজ সেই স্পর্শ ভাগ করে নিলেন শঙ্খ ঘোষ।

কাব্যরীতি, জীবনধারা পুরোপুরি পৃথক। শেষ কয়েক বছরে রাজনৈতিক অবস্থানও। তবু কিসের টান?

শুধু শেষ কয়েক বছরে নয়, ষাটের বা সত্তরের দশকেও রাজনৈতিক অবস্থান আলাদাই ছিল আমাদের। অবশ্য সে ছিল ভিন্নরকমের আলাদা। নানা কারণে শেষ কয়েক বছরে সেটা হয়তো একটু বেশি পরিমাণে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল সমাজে। কিন্তু সেইটেই যে ব্যক্তিসম্পর্কের কোনো গণ্ডি টেনে দিতে পারে না, এ বিশ্বাস আমাদের দুজনেরই ছিল। আমার দিক থেকে টানটা ছিল স্বাভাবিক। সৌন্দর্যভরা ব্যক্তিত্বের একটা টান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরস্পরের প্রতি এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভ্রম ছিল। তা কি কেবল লেখার কারণেই?

না, ওই আগেই যেমন বললাম, শুধুই লেখার কারণে নয়। ক্ষমাশীল সহৃদয় উদারচেতা এবং বিনীত এক ব্যক্তিস্বভাবের কারণে সবসময় ওঁকে শ্রদ্ধা করতাম আমি। তবে, সুনীলও যে কেন এতটা মান দিতেন আমাকে—দিতেন সত্যিই—সেটা চিরকালই আমার কাছে রহস্য থেকে গেছে।

লেখালিখি নিয়ে তর্ক হয়েছে কখনো? কবিতার ধরণ নিয়ে কোনো বিরোধ?

আমরা আলাদারকম লিখতাম, লেখা বিষয়ে মতেরও কিছু কিছু অমিল ছিল, কিন্তু কোনো 'বিরোধ' হয়নি তা বলে। মুখোমুখি তর্কও তেমন নয়। কাব্যাদর্শ নিয়ে সামনাসামনি কথাবার্তা হয়েছিল মাত্র দু-চারবার। একবার মনে পড়ে ১৯৬১-৬২ সাল নাগাদ, ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঘরে কথাপ্রসঙ্গে বেশ জোর দিয়ে সেদিন বলেছিলেন সুনীল 'মৃত্যু আর যৌনতা ছাড়া আর কিছুই ভাববার নেই কবিতায়।' আমি শুধু বিস্মিতভাবে বলেছিলাম 'তাই?' ব্যস্, ওই পর্যন্তই। আরেকবার ৬৭ সালের গোড়ায়, আমারই বাড়িতে। সে ছিল এক তাত্ত্বিক কথাবার্তা। এখনকার কবিতায় লিরিকটাকে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে, এই ছিল তখন ওঁর মত। একথাটা কি শক্তিকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারি? জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাকে। শক্তিকে সেটা আমি বলিনি অবশ্য, তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঁর নিশ্চয়ই কথা হয়েছিল। লেখায় প্রকাশ্য একটা তর্ক তুলেছিলাম মাত্র কয়েক বছর আগে, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে। ওঁর 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামের সংকলনটি বেরুবার পর। এ নিয়ে 'ব্যক্তিগত কুঠার' নামে আমার দীর্ঘ একটি আলোচনা পড়বার পর জানিয়েছিলেন সুনীল : 'লেখাটি পড়ে আমি মুগ্ধ।' 'কিন্তু কয়েকটা যে প্রশ্ন তুলেছিলাম?' 'হ্যাঁ, সেটা নিয়ে নিশ্চয় ভাবব। কিন্তু লেখাটা বড় ভালো লাগল!' এইরকম ছিল আমাদের তর্ক।

নন্দীগ্রাম-পরবর্তী সময়ে কোনো আড়ষ্টতা কাজ করেনি? এ নিয়ে কথা হতো?

খুব-যে বেশি কথা হতো, তা নয়। তবে, আমার স্বাভাবিক আড়ষ্টতাটুকু ছাড়া বাড়তি কোনো আড়ষ্টতা এর জন্য তৈরি হয়নি। নন্দীগ্রাম-কাণ্ডের অল্প আগেই রাজনৈতিক একটা দূরত্বের জায়গা তৈরি হয়েছিল ২০০৭-এর বইমেলা নিয়ে। ময়দান থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে বুদ্ধদেব তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, আর সেই অনুষঙ্গেই ময়দানে চেয়ার-টেবিল পেতে মেলা হিসেবে একটা প্রতিবাদের আয়োজন করেছিলেন লেখক-কবিদের একটা অংশ। একটা চিরকুট লিখে জানিয়েছিলাম যে প্রতিবাদের এই ধরণটা আমি পছন্দ করছি না। পরে শুনলাম সুনীল বলে দিয়েছেন যে মেলায় এবার 'কৃত্তিবাস'-এর স্টল থাকবে না এবং সুনীল নিজেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে যাবেন না। ওঁর ঘরে বসেই পরে আমি বলেছিলাম 'এ সিদ্ধান্তটা বোধহয় ঠিক হয়নি।' একটু সময় চুপ থেকে সুনীল বললেন : 'আমারও এখন মনে হচ্ছে সেটা। কিন্তু স্টল দেবার সময় তো আর নেই, তবে নিজে একবার যাব ভেবেছি।'

নন্দীগ্রাম-ঘটনার পর আমাদের দুজনের অবস্থান কাগজেই দেখেছি দুজনে। ভেবেছি, এ-রকম ভিন্নমত তো হতেই পারে। প্রথম দিকটায় এ নিয়ে কথা হয়নি কিছু, আড়ষ্টতাও নয়। কিন্তু বেশ কিছু পরে দেখা হলো একটা ছবির প্রদর্শনীতে, তসলিমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দেবার আয়োজন চলছে তখন। কী করে এই অন্যায়টার প্রতিরোধ করা যায়, ভিতরের একটা ঘরে গিয়ে তা নিয়ে কথা বলছি আমরা, পাশে ছিলেন শুধু অধৃষ্য কুমার। প্রসঙ্গত সেদিন কথা উঠেছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়েও। সুনীল বলেছিলেন 'কিন্তু শিল্পটারও তো দরকার!' 'সে তো নিশ্চয় দরকার। কিন্তু সমস্যা তো তা নিয়ে নয়, সমস্যা হলো এর পদ্ধতি নিয়ে। পদ্ধতির ভুলভ্রান্তিহিংস্রতা নিয়ে আপত্তিটা তো তোলাই উচিত।' সুনীল বলেছিলেন : 'হ্যাঁ, পদ্ধতিটা ঠিক হয়নি, ওভাবে করা উচিত হয়নি ঠিকই।' বলেছিলাম আমি 'এতটাই এখন মনে হয়, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অন্তত পাঁচ বছরের জন্য হলেও এ-সরকারের সরে যাওয়াই উচিত।' অধৃষ্য এবং সুনীল দুজনেই কিন্তু সায় দিলেন তাতে। কেবল, সুনীল সেইসঙ্গে একটু বিমর্ষ মুখে আরো বললেন 'সেটা খুবই ঠিক। একটানা ক্ষমতায় এভাবে থাকা ঠিক নয়। তবে মুশকিল হলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদল হলে যিনি আসবেন, সেটা ভাবতেই একটু অস্বস্তি হয়।'
'সেই ঝুঁকিটুকি তো নিতেই হবে।'

সমস্ত জীবন জুড়ে, এই মাত্র ছিল আমাদের রাজনৈতিক সংলাপ। এতে কোনো পক্ষেই কোনো বাড়তি আড়ষ্টতার চিহ্ন ছিল বলে তো মনে পড়ে না। চমকে উঠেছিলাম শুধু বছরখানেক আগে ছাপার অক্ষরে রণজিৎ গুহের একটা চিঠি পড়ে। অস্ট্রিয়া থেকে ২০০৭ সালে ১৭ এপ্রিল সুনীলকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি 'এদিকে তো নন্দীগ্রাম নিয়ে তোমার ও শঙ্খবাবুর মতভেদের খবরটা গত ৩/৪ দিন প্রায় আন্তর্জাতিক সমস্যার মতো বিরাট উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে মনে হয়...'। এ-চিঠি পড়ে সুনীলের কী মনে হয়েছিল জানি না, আমার তো চোখ কপালে ওঠার জোগাড়!

সাহিত্যকীর্তির বাইরেও বহু মানুষের কাছে ভরসার ক্ষেত্র হয়ে ওঠা, যা আপনার ক্ষেত্রেও সত্যি—এ কি এক ধরণের জীবনদর্শনের ফল?

জীবনদর্শনের ফলে তো ওটা হয় না, ওরই ফলে গড়ে ওঠে হয়তো-বা কোনো জীবনদর্শন। তবে এ-জাতীয় শব্দকে নিশ্চয়ই প্রত্যাহার করতে চাইতেন সুনীল। কথাটা হলো, ওঁর মনের প্রসার, আর ভালোবাসার ক্ষমতা। চারপাশের লোকজন যখনই একটু মমতা পায়, প্রশ্রয় পায়, তখনই সেখানে তাদের নির্ভর জন্মে যায়। তখনই মনে হয় ইনি আমার আত্মজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, আমার পক্ষে কিন্তু অতখানি ভরসাস্থল হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। আমার স্বভাবের মধ্যে একটা দূরত্ব রয়ে গেছে কোথাও, অনেকেরই পক্ষে সেটা যে বেশ বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা আমি জানি।

ওঁকে ঘিরে কোন্ স্মৃতি এই মুহূর্তে সবচেয়ে উজ্জ্বল?

এই সময়টায় তো চলচ্চিত্রের মতো গোটা জীবনের স্মৃতিটাই জড়িয়ে জড়িয়ে আসতে চায়। কেবল আমারই নয়, সবারই সেটা হবার কথা। তবু বিশেষ একটা মুহূর্তের কথা বলি। তখন আমি আয়ওয়ায়, সপ্তাহতিনেক হলো আছি। সন্তানজন্মের খবর নিয়ে সুনীলের একটা চিঠি এসে পৌঁছল। সে-চিঠিতে লেখা ছিল একটা ঘটনার কথা। নার্সিং হোমে স্ত্রীপুত্রকে দেখে আসবার পর রাতে বাড়ি ফিরছেন যখন, ঘটনাটা সেলিব্রেট করবার জন্য নেমে পড়লেন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। সেখানকার পরিচিত এক বাংলা মদের দোকানে এসে হুকুম করলেন পানীয়ের। চেনা দোকানের কর্মী, ভিড়ের মধ্যে তাঁকে বসিয়ে, এনে দিল একটি পাত্র। সে-পাত্রে চুমুক দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে সুনীলের মনে হলো 'এ তো রোজই করি, এতে তো সেলিব্রেশন নেই। ছেলে হয়েছে বলে বরং না-খেয়ে সেলিব্রেট করি।' সবাইকে অবাক করে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। পরদিন ভোরবেলাকার কাগজে একটা খবর দেখলেন, ওই দোকানেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-সন্ধ্যায় বিষমদ খেয়ে মারা গেছে জনাপঞ্চাশ মানুষ। লিখেছিলেন সুনীল : নবজাতক ছেলেই আমাকে বাঁচিয়ে দিল।

'অর্ধেক জীবন'-এ ঘটনাটার কথা কিন্তু লেখেননি সুনীল। ছেলেকে কিংবা স্বাতীকে কি বলেছিলেন কখনো? জানি না ঠিক।

সত্যিকারের মৃত্যুর পর সম্ভাব্য সেই মৃত্যুছবিটা মনে পড়ছে কেবলই।

ওঁর এক সময়ের জীবনধারার নানারকম ব্যাখ্যা হয়েছে। সে-বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

নানারকমের ব্যাখ্যা বিষয়ে তো আমার কিছু বলবার নেই। ওই জীবনধারা নিয়ে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে নীতিবাদীদের চোখ দিয়ে কখনো দেখিনি সেটাকে। বা, বলা যায়, দেখিনি মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টি থেকে। গত প্রায় পনেরো বছর ধরে বামপন্থী মহল সুনীলকে তাদের নিতান্ত আপনজন ভাবছিল, ষাটের বা সত্তরের দশকে ঠিক সেই চেহারাটা কিন্তু ছিল না। কৃত্তিবাসগোষ্ঠীর রচনাদর্শ বা জীবনশৈলী যে সাহিত্য আর সমাজকে অবক্ষয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দিচ্ছে— এইটেই ছিল সেদিন বামপন্থী মহলের ঘোষিত দৃষ্টিভঙ্গি। আমার সে-রকম উদ্‌বেগ হয়নি। শিল্পীর জীবন অনেকসময়েই বাঁধনছেঁড়া হয়, হতে পারে, এইরকমই ভেবেছি আমি। শিল্পীজীবনের সেটা একমাত্র পথ বলে ভাবিনি কখনো, ভেবেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যতম পথ। সে-পথে কেউ চলতে চান যদি, আমি তার বিচার করবার কে?

আত্মকথনভিত্তিক, স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার ভাষ্য নিয়ে এলেন উনি। একধরণের জীবনযাপন কি এর জন্য প্রেরণা জুগিয়েছে?

জীবনযাপনের বিশেষ একটা ধরণের জন্যই যে 'স্বীকারোক্তিমূলক' লেখা লিখেছেন সুনীল, তা আমার মনে হয় না। প্রবণতা একটা ছিলই গোড়া থেকে। সে-প্রবণতাকে সর্বাত্মক প্রেরণা জুগিয়েছে হয়তো গিন্‌সবার্গের একটা চিঠি। পরিচয়ের প্রথম পর্বেই একটা চিঠিতে উনি লিখেছিলেন, কীরকম হবার কথা আজকের দিনের কবিতার। কন্‌ফেশান্‌স, রিসেন্টমেন্টস, এনথুসিয়াজিম্‌স—সেটা থেকেই হয় কবিতা, হয় রিয়্যাল অ্যাকচুয়াল প্রাইভেট ফিলিংস থেকে—লিখেছেন তিনি। সুনীলের কাব্যাদর্শে এই চিঠিটাকে একটা গুরুতর প্রসঙ্গ বলে আমি মনে করি।

ওঁর গদ্য, না পদ্য—কোনটা আপনাকে বেশি টানে?

কবিতার প্রতিশব্দ হিসেবে পদ্য কথাটা আমি ব্যবহার করি না। প্রশ্নটা নিশ্চয় এই যে সুনীলের গদ্য আর কবিতার মধ্যে কোনটা আমাকে বেশি টানে? উত্তরে বলি : কবিতা। সেইসঙ্গে গদ্যশৈলীটাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ যদি হঠাৎ আরেকবার দেখা হয়ে যায় কোথাও—কী বলবেন?

এতকাল দেখা হলে যেটা বলতাম। বলব : 'ভালো তো?'

২০১২

AMARBOI.COM

'পরমা' পত্রিকার পক্ষে এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন শ্রীজাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ উৎপল

নীলাঞ্জন হাজরা : উৎপলদার সঙ্গে আপনার পরিচয় কত দিনের? সম্পর্কে বোধ হয় আপনার শ্যালক ছিলেন...

শঙ্খ ঘোষ : হ্যাঁ। দেখাশোনার পরিচয় ১৯৫৬ সাল থেকে। যে বছর আমার বিয়ে। উৎপল যখন স্কুল থেকে সবে কলেজে— স্কটিশচার্চে ভর্তি হয়েছে, মানে ১৯৫১-র নভেম্বর-ডিসেম্বর ওর মাসতুতো দিদি প্রতিমার সঙ্গে আমার পরিচয়, যিনি পরে আমার স্ত্রী হন। ১৯৫২ সালের শেষ দিকে প্রতিমা আমায় একটা খাতা দিয়ে বলে যে, 'আমার ভাই কবিতা লেখে, দেখো তো কেমন লাগে?' কবিতাগুলো ১৯৫১-৫২ সাল নাগাদ লেখা।

তার মানে কি এই কবিতাগুলিকে সঙ্কলিত করেই উৎপলদার প্রথম বই 'চৈত্রে রচিত কবিতা' তৈরি হয়?

না। এ কবিতা কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সেই খাতা আমি উৎপলের দিদিকে ফেরত দিয়ে বলেছিলাম, 'এ-লেখাগুলো এখনও ঠিকঠিক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এ খুব ভালো লিখবে।' তারপর 'কৃত্তিবাস'-এর তৃতীয় সংখ্যা থেকে— মানে ১৯৫৩ সালের শেষ থেকে— ছাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষরে ওর লেখা বেরোতে শুরু করল। ১৯৫৪ সালে 'কৃত্তিবাস'-এর চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা একসঙ্গে বেরোল। তার সম্পাদকের মধ্যে একজন উৎপলকুমার বসু।

সেই কবিতাগুলি কি তবে পরে 'চৈত্রে রচিত কবিতা'য় গ্রন্থিত হয়েছিল?

সবগুলি নয়। এর মধ্যে কিছু কিছু কবিতা কোথাও গ্রন্থিত হয়নি। যাই হোক, তা হলে দেখা যাচ্ছে, পরিচয়ের পরের ধাপটা হয়েছিল 'কৃত্তিবাস'-এর ছাপা কবিতার মধ্য দিয়ে। তখনও আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। কিন্তু যখন পড়ছি, তখন তো ঠিক অপরিচিত কারো কবিতা পড়ছি না। আমার বান্ধবীর ভাইয়ের কবিতা পড়ছি। কবিতাগুলি ভালো লাগছিল। কিন্তু বিশিষ্ট কিছু নয়। ১৯৫৬ সালে আমাদের বিয়ের পর যখন আমরা বহরমপুরে 'সরলা-কুটির' নামের একটি বাড়িতে থাকি, সে সময়ই উৎপলের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সেখানে আমাদের একটা গ্রামোফোন ছিল, তাতে উৎপল এক সন্ধ্যায় আমাদের কয়েকটা রেকর্ড শোনাল, তার মধ্যে ছিল কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' আর 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে', আর বেটোফেন-এর 'মুনলাইট সোনাটা'। শুনতে শুনতে সুর নিয়ে, সংগীত নিয়ে, বেটোফেন নিয়ে কিছু কথাবার্তা হতে লাগল। সেই সন্ধ্যায় ওই কুড়ি বছরের ছেলেটির ভাবনার অনুভূতির বিস্তৃতি আর গভীরতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারছিলাম, ওর ভাবনাচিন্তা বা দেখার ধরণটাই আলাদারকম। তারপর ১৯৫৭ সালে তো কলকাতায় চলে আসি। উৎপলের সঙ্গে তখন থেকে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকে।

এরপর তো ১৯৬১ সালে 'চৈত্রে রচিত কবিতা' প্রকাশিত হয়। আপনি এ বই গড়ে উঠতে দেখেছেন। বই হিসেবে যখন সেটা হাতে পেলেন, আপনার অনুভূতি কী হয়েছিল?

বইটা যখন বেরোল, তখন মনে হয়েছিল যে, আরো একটা ভালো কবিতার বই বেরোল। যে উৎপলকে পরে আমরা জেনেছি, সেই চেহারাটা কিন্তু তখনও আসেনি। শুধু কয়েকটি কবিতার কিছু কিছু লাইন কেবলই মনে গুনগুন করত। একটি যেমন, 'গত পূর্ণিমায়' নামে ন-লাইনের কবিতা, যার প্রথম কথাটা ছিল, 'জ্যোৎস্না এখানে নেই' আর শেষ উচ্চারণ 'এত আগে কেউ কি এসেছে?' এই ছবিটা আমার প্রায়ই মনে পড়ে।

'চৈত্রে রচিত কবিতা' যখন তৈরি হচ্ছে, সেটা কিন্তু বামপন্থী আন্দোলন দানা বাঁধারও সময়। খাদ্য আন্দোলন তুঙ্গে, অথচ 'চৈত্রে রচিত কবিতা'-য় তার কোনও ছাপ নেই। আপনি বিস্মিত হননি?

না, আমি একেবারেই বিস্মিত হইনি। তার কারণটা বুঝতে গেলে, সেই সময়কার কবিসমাজের পুরো চেহারাটা মনে রাখা দরকার। ১৯৪০-এর দশক থেকে বয়ে আসছিল দুটো পরস্পর-প্রতিস্পর্ধী ধারা— একটা হলো প্রত্যক্ষ সমাজসচেতন কবিতার জগৎ; আর একটা হলো এর প্রতিক্রিয়ায় বা বিপরীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলাকৈবল্যবাদী কবিতার ধারা। 'কৃত্তিবাস' কবিতায় যাঁরা লিখছিলেন, তাঁরা সকলেই এ দুটোকে বাইরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন— কেউ হয়তো সচেতন ভাবে, কেউ ততটা সচেতন ভাবে নয়। উৎপল তো সেই গোত্রের মধ্যেই ছিল। আর 'কৃত্তিবাস'-এ যাঁরা নিয়মিত লিখতেন, বামপন্থী শিবির তাঁদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিজনক মনে করত। উৎপল তো অল্পদিনের জন্য সম্পাদকদেরই একজন ছিল। সেও ওই গোষ্ঠীগত ভাবে বামপন্থীদের থেকে মানসিক দূরত্ব রেখেই চলত।

এরপর ১৯৬৪-তে এসে 'পুরী সিরিজ' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হল। আমার অন্তত মনে হয়েছে যে, এই বইয়ে আমরা 'চৈত্রে রচিত কবিতা'-র লেখকের থেকে সম্পূর্ণ অন্য একজন কবিকে পাই। আপনারও কি তখন তেমনটাই মনে হয়েছিল?

১৯৬৪ সালের এক সন্ধ্যেবেলা— সে দৃশ্যটা এখনও আমার পরিষ্কার মনে পড়ে— লেকের কাছে ছোটো একটা সভা থেকে বেরিয়ে ল্যাম্পপোস্টের নীচে ফুটপাথে বসে একটা ছোট্ট বইতে আমার নাম লিখে উৎপল আমার হাতে দিল। দিয়ে বলেছিল, 'এই বইটার একটাই মাত্র গুণ আছে, কোনো ছাপার ভুল পাবেন না।' বাড়ি ফিরে সেদিন রাতেই গোটা বইটা পড়ে ফেলি। এর কয়েকটা লেখা আগে পড়া। বইটাতে ছাপার ভুলও দু-একটা পাওয়া গেল। কিন্তু সে-বই পড়ার সেদিনকার রাতের অভিজ্ঞতা এখনও ভোলা যায় না। এটা কোনো 'আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ভালো কবিতার বই' মাত্র নয়। ভাষার ব্যবহারে, দেখার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নতুন এক উদ্ভাসন। এত দিনকার বাংলা কবিতার কোনো চিহ্ন এর মধ্যে নেই। এর বছর দশেক পর থেকে আমার মনে হতে থাকল, এ রকম কৃশ একটা বই পরবর্তী কবিদের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনীয় নজির খুব কমই আছে। প্রভাবের দিক থেকে র‍্যাঁবো-র 'নরকে এক ঋতু'-ই হয়তো এর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয়।

উৎপলদার কবিতার বইগুলির মধ্যে আপনার সব থেকে প্রিয় কোনটি?

'পুরী সিরিজ'। সেটা এতটাই যে, 'আবার পুরী সিরিজ' যখন বেরোচ্ছে, তখন আমি তার মধ্যে 'পুরী সিরিজ'-কে অন্তর্গত করার ঘোর বিরোধী ছিলাম। ১৯৭৮ সালে 'আবার পুরী সিরিজ' বেরোলেও এর আয়োজন চলছিল অনেক আগে থেকে, যখন উৎপল বিদেশে। পারস্পরিক চিঠিপত্রে সে-সময়ে এ নিয়ে আমাদের কথা চলছিল। ওর যুক্তি ছিল, কবিতাগুলি বেশির ভাগই 'পুরী সিরিজ'-এর সমকালীন লেখা আর আমি বলেছিলাম, সমকালীন লেখা দিয়ে স্বতন্ত্র বই হতে পারে। কিন্তু 'পুরী সিরিজ' একটা নিজস্ব সত্তা পেয়ে গেছে, তার সঙ্গে আর কিছু জড়ানোটা ঠিক নয়। নানা কারণেই উৎপল সেটা মানতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে বললেন, 'পুরী সিরিজ' একটা 'নিজস্ব সত্তা' পেয়ে গেছে, এই ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?

কোনো কবিতার বই কিছু কবিতার সংগ্রহমাত্র নয়। প্রথম থেকে শেষ কবিতা পর্যন্ত তার একটা চলন থাকে। তার পারম্পর্যেরও একটা মানে তৈরি হয়। সেইটাই একটা সত্তা তৈরি করে ফেলে। এমন নয় যে, সব বইতে সেটা থাকে। কিন্তু 'পুরী সিরিজ' বইটিতে সেটা আশ্চর্য ভাবে সজীব ছিল। এই জন্যেই এর অন্য রকম চেহারা দেখার কথা ভাবতে আমার পছন্দ হচ্ছিল না। উৎপল, একটা কথা আমাকে চিঠিতে লিখেছিল, 'পুরী সিরিজ' আসলে একটা নাটক। আমিও সেটা ভাবি। নাটকে যেমন নানান চরিত্র এসে কথাবার্তা বলে যায়, এও যেন সেইরকম নানা চরিত্রের স্বল্পবাক উপস্থিতি। আসলে এইভাবে উৎপল তার পরবর্তী চিন্তার দিকে এগোচ্ছিল, যে চিন্তায় এক সময়ে mixed media-কেই আত্মপ্রকাশের সর্বোত্তম উপায় বলে তার মনে হতে থাকে।

আপনি বললেন যে, উৎপলদা পরবর্তী চিন্তার দিকে এগোচ্ছিলেন এবং সেই চিন্তাটায় mixed media-কেই আত্মপ্রকাশের সব থেকে ভালো উপায় বলে তার মনে হচ্ছিল। এর পর উৎপলদা এই সেদিন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে লিখে গিয়েছেন— 'আবার পুরী সিরিজ', 'লোচনদাস কারিগর', 'সলমা জরির কাজ', 'সৌরলতা' এমন বহু এই বেরিয়েছে। সেসবের মধ্যে কি আপনি সেই এগিয়ে যাওয়াটা দেখেছেন? দেখে থাকলে, কী ভাবে দেখেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা বোঝাতে গেলে, প্রথমে ওর বিদেশবাসের পর্বটাকে বুঝতে হবে। সেখানে যাওয়ার প্রাথমিক পর্বে কবিতা বিষয়টার ওপর ওর একটা অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। আমাকে চিঠিতে এরকম কথাও লিখেছে যে, কবিতা লেখার কোনো মানেই হয় না। আরো একটা কথা লিখেছিল, 'আমি এখন সোশ্যালিস্ট হয়ে গেছি'। প্রত্যক্ষ জীবনের লড়াইটাকে সে অনেক সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছিল তখন। আর ও-দেশের নানা শিল্পান্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কিছু চেতনার সঞ্চার হচ্ছিল ওর মধ্যে। 'আমাদের লেখা কি এখনকার ছেলেরা কেউ পড়ে?' এটাও জানতে চেয়েছিল একবার। দেশে ফিরে আসার পর, বা তার কিছুটা আগে থেকেই, কবিতা বিষয়ে তার সেই বীতরাগ সরে যেতে থাকে আর 'লোচনদাস কারিগর' থেকে শুরু করে 'হাঁস চলার পথ' পর্যন্ত ওর নিজস্ব রহস্যময় ভাষায় এ দেশের নাগরিক বা গ্রামীণ দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের কথাই ও বলতে থাকে। 'সুখ দুঃখের সাথী' কথাটা যেন তার ঠিক ঠিক মর্যাদা পেয়ে যায়।

আপনি 'পুরী সিরিজ'-এর কথা খুব জোর দিয়ে বললেন। একটা প্রশ্ন— 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র পর 'পুরী সিরিজ' যখন বেরোল, আমরা এক নতুন কবিকে যেন পেয়েছিলাম। কিন্তু তার পর কি তিনি কিছুটা আটকে গেলেন? শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর যে লেখা, বৈচিত্র্যের দিক থেকে কি তা উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়েছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে আটকে গেল বলে আমার মনে হয়নি। যে রহস্যময়তা দিয়ে 'পুরী সিরিজ' তৈরি, সেই রহস্যধারাই চলে এসেছে ওর শেষ লেখা পর্যন্ত। কিন্তু তার ধরণটা ঠিক একই থাকেনি। 'পুরী সিরিজ' ছিল অনেকটা ঠাসবুনোটের। 'লোচনদাস' থেকে সেটা উৎপল খানিকটা আলগা করে দিতে থাকে। আর সেইসঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন তার অনেক খুঁটিনাটি নিয়ে ওর কবিতায় দেখা দিতে থাকে। এর থেকে একটা নতুন স্বাদ তৈরি হয় বলে আমার মনে হয়। 'পুরী সিরিজ'-এর কবি রহস্যে ভরা দূরের মানুষ, আর শেষ পর্বের কবি রহস্যে ভরা কাছের মানুষ। 'পুরী সিরিজ'-এর রহস্যে আছে একটা মদিরতা। আর পরের দিকের কবিতায় সেই রহস্যে আসে একটা মেদুরতা। একে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ পরিবর্তন বলা যায় না। কিন্তু এক ধরনের অভিযাত্রা এর মধ্যে টের পাওয়া যায়।

আপনি উৎপলদার 'রহস্যময় ভাষা'র কথা বললেন। আমার মনে হয়েছে উৎপলদার কবিতা নানা সংকেত ভরপুর। আপনারও কি তাই মনে হয়? সে সব সংকেত আপনার কাছে কী ভাবে পৌঁছয়?

আমার কাছে কী ভাবে পৌঁছয় সেটা বড় কথা নয়, প্রশ্ন হলো, যে-কোনো পাঠকের কাছে সেটা কী ভাবে পৌঁছয়। পৌঁছয় একেবারেই পাঠকের নিজস্ব বোধ মতন। এটা তো বলাই হয় যে, একটা গোটা কবিতার চারপাশে অনেক না-বলা কথা থাকে, সেই সঙ্গে এও বলা যায়, গোটা কবিতায় শুধু নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার প্রতিটি লাইনের চার পাশেই একটা না-বলা বলয় থাকে। আবার এও বলা যায়, প্রতিটি শব্দ বা ছবির চারপাশে যুক্তিক্রমহীন একটা দূরত্বের ব্যবধান থাকে। তখনই সম্পূর্ণ রহস্যময় হয়ে ওঠে কবিতা। এই রহস্যেরই দিকে নিয়ে যায় উৎপলের কবিতা।

এ তো গেল উৎপলদার কবিতা নিয়ে কিছু কথা। কিন্তু উৎপলদা দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশি সময়কাল আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়, কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি বলবেন?

সে তো অনেক স্মৃতি। একটা সুখের সময়ের গল্প বলি। আমেরিকা থেকে ফিরছি আমি।

কোন সাল নাগাদ?

১৯৬৮-র জুন মাস। কথা হয়ে আছে, লন্ডনে উৎপলের বাড়িতে সাত দিন কাটিয়ে ইউরোপ যাব। এয়ারপোর্টে হাজির উৎপল। কিন্তু আমাকে বলল, 'আধ ঘণ্টা একটু অপেক্ষা করতে হবে। পরের ফ্লাইটে জার্মানি থেকে আমার এক বন্ধু আসছে, তাকে নিয়ে একসঙ্গেই ফিরব। আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন।' আমি বেশ দুঃখিত মুখে বসে রইলাম। দুঃখিত, কেননা ভেবেছিলাম অনেক দিন পর স্বচ্ছন্দে বাংলায় কথাবার্তা বলব। কিন্তু আবারও সেই ইংরেজি। খানিক পরে উৎপল আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, 'উনি এসে গেছেন, উঠুন।' করমর্দনের জন্য তৈরি হয়ে পিছন ফিরে আমি স্তম্ভিত— সামনে দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ওর দিদি, আমার স্ত্রী। তারপর সমবেত হাস্যরোল। আর তার পর সাত দিন ধরে উৎপলের নতুন, তবু কেনা গাড়িতে উৎপল, সান্ত্বনা, ইভা (প্রতিমা) আর আমি যে ভাবে লন্ডন আর তার চারপাশ ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, সেই স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আপনার স্ত্রী জার্মানি থেকে এলেন, আপনি জানতেন না?

না। একেবারেই জানতাম না। কথা ছিল, আমার প্রবাসজীবনের শেষ দিকে সেও এসে যোগ দেবে আমেরিকায়। পৌঁছবার দিনক্ষণ সব ঠিক। আমি ওকে আনতে যাব শিকাগোতে। সেই মুহূর্তে ট্রাভেল এজেন্ট জানালেন, আসাটা বাতিল হয়ে গেছে। ব্যাপারটা হয়েছিল এরকম— বাড়ি থেকে যখন প্রতিমা রওনা হচ্ছে, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে একজন এসে একটি চিঠি ধরিয়ে বাতিল করেন এই যাত্রা। কেননা, ও না গিয়ে টিকিট ক্যানসেল হলে সরকারের কিছু ফরেন এক্সচেঞ্জ উপার্জন হবে। কাজেই, ওর আসা হলো না। এরকম ঘটনা অবশ্য এর আগে বা পরে আমি জীবনে কখনো শুনিনি। যাই হোক, সেটাই আমার শেষ জানা ছিল। এ দিকে ও বেপরোয়া হয়ে জার্মানিতে ওর এক দাদার কাছে চলে যায়। আমার লন্ডনে আসার দিনটা ওর জানা ছিল, জার্মানিতে কয়েক দিন কাটিয়ে ও সেই দিনই লন্ডন এসে পৌঁছনোর পরিকল্পনা করে। উৎপলের সেটা জানা ছিল, কিন্তু আমার কাছে রহস্য রেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিল। এটা কবিতার রহস্যময়তা নয়, জীবন নিয়ে রহস্য করা।

বুঝলাম। যাই হোক, আপনি আপনাদের লন্ডন সফরের গল্প বলছিলেন...

পুরো সফরের গল্প তো আর বলা যাবে না। একটা বলি। আমাদের থাকার সময়ের মধ্যেই ঘটে গেল লর্ডস-এ ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট। এ সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? উৎপলও রাজি হলো। ঠিক হলো, সবাই মিলে যাওয়া হবে। পরদিন ভোর ছ-টায় উঠে আমি তো সবাইকে তাড়া দিচ্ছি মাঠে যাওয়ার জন্যে। উৎপল অবাক হয়ে বলে, 'খেলা তো দশটায়।' আমি বলি, 'সে তো ঠিক, কিন্তু লাইনে তো দাঁড়াতে হবে।' উৎপল হেসে বলে, 'না, না। তেমন কিছু নয়, এ তো কলকাতা নয়।' আমি উসখুস করতে থাকি। শেষ পর্যন্ত আটটা নাগাদ বলেই বসি, 'আমি তা হলে এগোই, তোমরা পরে এসো। কিউ রাখতে হবে তো।' উৎপল উদাসীন ভাবে বলে, 'যান।' আমি শশব্যস্তে পৌঁছে যাই লর্ডস-এ। কোথাও কোনো লাইন নেই। পৌনে দশটার সময় সবাইকে নিয়ে উৎপল এসে হাজির। এসে জিজ্ঞেস করল, 'লাইন রেখেছেন তো?' লজ্জিত এবং মসৃণ ভাবে ঢুকে যাই লর্ডস-এর গ্যালারিতে। উৎপল মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

লন্ডনের অন্য একটা সুখস্মৃতি উৎপলের সঙ্গে গিয়ে নিমাই চট্টোপাধ্যায় আর রণজিৎ গুহ-র সঙ্গে কয়েক সন্ধ্যার আড্ডা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ-বিদেশের সাহিত্য আর সংস্কৃতি নিয়ে। নিমাইদা সেখানে এজরা পাউন্ড থেকে শুরু করে তখনকার তরুণ কবি এবং নাট্যকার লেরয় জোন্‌স পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গ তুলে আর প্রশ্ন নিয়ে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন।

এ ছাড়া ছিল কীটস্‌-এর বাড়িতে ঘোরা, যেটা উৎপলের বাড়ির বেশ কাছেই। আর বহু দূরে, স্ট্র্যাটফোর্ড অন অ্যাভন-এ গিয়ে শেক্সপিয়রের ঘরবাড়ি দেখা। সে ঘরে পৌঁছনোর অনেক আগে থেকেই মনে হচ্ছিল, আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে পৌঁছে গেছি। আর শেক্সপিয়রের ঘরে দাঁড়িয়ে মনে হলো, লেখার টেবিল ছেড়ে এক্ষুনি উঠে গেলেন, এক্ষুনি আবার আসবেন। আর এইসব দেখার সঙ্গে সঙ্গে উৎপলের নানা চিন্তার প্রকাশ ঘটতেই থাকত।

AMARBOI.COM

'এই সময়' পত্রিকার পক্ষ থেকে নীলাঞ্জন হাজরার নেওয়া সাক্ষাৎকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবহমান মণিভূষণ

মাস কয়েক আগে, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি হলে আয়োজিত এক সভায় আলোচনা চলছিল নকশালপন্থী আন্দোলনের প্রবহমান প্রভাব বা অপপ্রভাব বিষয়ে, ভিন্ন ভিন্ন দশকের এক-একজন প্রতিনিধি বলছিলেন তাঁরা কে কীভাবে কতটুকু পেয়েছেন সে-আন্দোলনের তাপ বা ইশারা, কীভাবে তাঁদের জীবনবোধর গড়নে সাহায্য করেছে সেটা। কিছু প্রশ্নোত্তরও চলছিল সেই সঙ্গে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক-সামাজিক আবহটা এইভাবে সেদিন উঠে আসছিল সভাঘরটিতে। তার মধ্যে অবশ্য সাহিত্যের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না।

সভা শেষ হলো, সেকথা ঘোষিত হবার সময়ে বক্তাদের মধ্যে একজন জানালেন তিনি একটি কবিতা পড়তে চান।

পড়লেনও তার পর। 'পড়লেন' বলা ভুল হলো, বলা উচিত : 'বললেন'। স্মৃতি থেকে দীর্ঘ একটি কবিতা শোনালেন সেই মানুষটি। কবিতাটির নাম 'বেকারের চিঠি'। মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতা।

এ কোনো কবিতাপাঠের আসর নয়। মণিভূষণের জন্য কোনো স্মৃতিসভা নয়। কোনো আবৃত্তিকার নেই সে-সভায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধরণের সভা শেষ হলো মণিভূষণের কবিতাপড়ার মধ্য দিয়ে।

এক হিসেবে সেটা তত অপ্রত্যাশিত ছিল না হয়তো। আলোচনা চলছিল নকশালপন্থার প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে, সেই চেতনার প্রবহমানতা নিয়ে। এখানে তো কারো কারো ওঁর কবিতার কথা মনে পড়তেই পারে, কেননা মণিভূষণ তো চিহ্নিতই ছিলেন নকশালপন্থীদের আপনজন হিসেবে, যেন তাঁদেরই কবি তিনি। আলোচনার টানে তাই উঠে আসতেই পারে তাঁর কবিতা, স্বতন্ত্র কোনো কবিতা হিসেবে নয়, আন্দোলনেরই একটি স্বর হিসেবে।

আরো একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে হয় তাহলে, বলতে হয় আরো একটা সভার বৃত্তান্ত। সে-সভায় কোনো রাজনীতিপ্রসঙ্গ নেই। নেই কোনো কবিতারও কথা। কবিতাসমাজ থেকে দূরবর্তী ভিন্ন এক ছবির বইয়ের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করছিলেন যিনি, যথাযথভাবেই তিনি সম্পন্ন করছিলেন তাঁর নির্ধারিত কাজ। সেই সঞ্চালনায়, সভাসমাপ্তি ঘোষণা করবার আগের মুহূর্তে তিনি আবৃত্তি করে বসলেন একটি কবিতা, আর সে-কবিতাও মণিভূষণের, 'পদ্ধতি' তার নাম। হঠাৎ এই কবিতাটি ওখানে পড়া ঠিক হলো কি না, এ নিয়ে হয়তো সঞ্চালকের কোনো দ্বিধাবোধ কাজ করছিল। মঞ্চ থেকে নেমে জানতে চেয়েছিলেন একান্তে 'ঠিক করলাম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই ঠিক করেছিলেন তিনি। ছোটোখাটো অনুষ্ঠানটির মর্যাদাই বেড়েছিল তাতে।

২

যৎসামান্য ওই ঘটনাদুটি এখানে উল্লেখ করবার একটা কারণ আছে। মণিভূষণ ভট্টাচার্যের অনুরাগী গুণগ্রাহী এক পাঠক সম্প্রতি একটি প্রশ্ন তুলেছেন—মাঝে মাঝে অন্যত্রও উঠছে এই প্রশ্ন—পাঠকসমাজে তাঁর অভিঘাত কি ফুরিয়ে এসেছে? কেননা তাঁকে নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো স্মরণসভার আয়োজন সে-পাঠকের চোখে পড়েনি, চারদিকে কেমন এক নীরবতার ভার।

কোনোই-যে স্মরণসভা হয়নি তা অবশ্য নয়, কিন্তু শুধু স্মরণসভার মধ্য দিয়েই কবি যে বেঁচে থাকেন তা নয়। সমালোচনা মহলে নিত্যনিয়মিত আলোচনা-প্রত্যালোচনাতেও তাঁর অস্তিত্বের তত প্রত্যক্ষতা থাকে না। সে-প্রত্যক্ষতা থাকে পাঠক হিসেবে নানা ব্যক্তিমানুষের জীবনযাপনের আকস্মিক উদ্‌ভাসনে, তার প্রগাঢ় আত্মীয়তায়। যে-দুটি সভার কথা বলেছি আগে (এ-দুটি নিছক ব্যতিক্রমী উদাহরণও নয়), তার মধ্যে কবিতা এসে পৌঁছবার কোনো কথাই ছিল না, কিন্তু তবু যে পৌঁছল, এবং তা পৌঁছল মণিভূষণের হাত ধরে, সেটাই প্রমাণ করে এ কবির রচনার সজীবতা, প্রত্যক্ষতা, প্রবহমানতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা কোনো পন্থার নামে চিহ্নিত হয়ে যাবার একটা বিপদ আছে। যথার্থ কবির কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস যখন কবিতায় প্রকাশ পায়, তখন সেই প্রকাশমুহূর্ত তাকে যতই একটা গণ্ডিবদ্ধ রাজনীতির সীমায় টেনে রাখুক না কেন, অল্প পরেই তা উত্তীর্ণ হয়ে যায়—যেতে পারে—সেই গণ্ডির অনেকখানি বাইরে। অর্থাৎ নকশালপন্থার আন্দোলনকালে মণিভূষণের কবিতা বড়ো একটা বাঁক নিয়েছিল, পালটে গিয়েছিল তাঁর ভাষা আর ছন্দ, জীবনের দিকে তাকানো তাঁর চোখ, স্পষ্টতই সে আন্দোলনের টানটোনগুলি পৌঁছে গেছে তাঁর কবিতায়, এটা ঠিক যে 'রাজহাঁস' (২০০৮) বইটির ভূমিকায় কবিকে কবুল করতে হয়েছিল :

> ১৯৬৫ সালে একটি বর্ষণসিক্ত দুপুরে রাজহাঁস ভাবনার প্রথম কবিতাটি লেখা হয়। সেই চিন্তন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মেধায় সক্রিয় ছিল। ধারাবাহিকভাবে কিছু চতুর্দশপদী রচনার পর কবিতা অন্য দিকে ঘুরে যায়।

কিন্তু সেইসঙ্গে এও ঠিক যে 'অন্য দিকে ঘুরে' যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রেরণাভূমি যে-আন্দোলন, তার অপম্রিয়মাণতার সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে গেল তাঁর চোখে দেখা জীবনটাও। রং পালটায়, কিন্তু নির্যাতিত জীবনের হাল দুঃখজনকভাবে একইরকমভাবে থেকে যায়, আমাদের মনের প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ আর নিভৃত দায়বোধ একইরকম থেকে যায় কোনো কোনো কোণে, একইরকম থেকে যায় আমাদের আর্ত অসহায়তা আর তার থেকে উত্তরণচেষ্টার ছবি। ধরা যাক 'বেকারের চিঠি'-র এই লাইনগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা শহরে আলো জ্বালে কিন্তু কুপিতে তেল নেই—
যারা কারখানা বানায় কিন্তু কারখানা যাদের
আস্তাকুঁড়ে চালান করে দেয়—
যারা কোনোদিন একটা ভালো জামা পরেনি,
সরবত খায়নি,
বেড়াতে গিয়ে পর্বতমালার স্তব্ধ নিরাসক্তি ও মহত্ত্বকে
স্পর্শ করেনি।
যারা জন্মায় আর খাটে, খাটে আর মরে,
যারা পিঁপড়ের মতো পোকামাকড়ের মতো
শীতরাত্রির ঝরাপাতার মতো—
সেইসব নিরক্ষর নগণ্য কুঁজো অবজ্ঞাত করুণ
যাদের দেখার জন্য এবং ঠকাবার জন্য আপনারা
বিরাট মঞ্চে উঠে দাঁড়ান—

এ কি কয়েকবছরের কালসীমায়িত জীবনছবি মাত্র? না কি এ আমাদের আবহমান জীবনেরই একটা আদল? এমনকী তার পরের লাইনকটারও যে প্রচ্ছন্ন স্পর্ধা আর স্বপ্ন, সেও নিতান্ত ক্ষণিক একটা কালচিহ্ন মাত্র নয়।

যারা আগামীদিনের ভারতবর্ষের গোটা পৃথিবীর এবং
সৌরজগতের মালিক—আমি তাদেরই একজন হয়ে
এই জংশন স্টেশনে বাদাম বেচে যাচ্ছি।

সার্থক রাজনৈতিক কবিতার অন্তর্গত আবেগ কোনো রাজনৈতিক সময়সীমায় আটকে থাকে না, অনেকসময়েই দেশসীমাকেও উত্তীর্ণ হয়ে যা তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশসীমার কথাটা বলতে গিয়ে আবারও মনে পড়ছে 'পদ্ধতি' কবিতাটির নাম। কবিতাটিতে আছে এক লেখকের কথা, যার লেখা 'ভাষায় এবং জ্বালায়'। যারা জ্বলে, তারা তার ডানহাতখানি কেটে নিয়ে গেল বলে সে শুরু করল বাঁ হাতে লেখা। বাঁ-হাতটাও কাটা হয়ে গেল বলে সে শুরু করল মুখে মুখে বলা, লিখে নিল তার পাঠকেরা। মুখে সিমেন্ট ঢুকিয়ে বলাও বন্ধ করা গেল তার। সমুদ্রতীরে গিয়ে বালির ওপর পায়ের আঙুল দিয়ে যখন সে শুরু করল লেখা, কাটা হলো তার পা-ও। আর তখন

সে বিশাল সমুদ্রগর্জনের দিকে কান পেতে
একটু হাসল। কারণ—
ততদিনে তার জায়গায় তার চেয়েও বেশি
শক্তিশালী আর দূরদর্শী
তিনজন লেখক
এসে গেছে।

এ-কবিতা হতে পারত যে-কোনো সময়ের কবিতা। এই মুহূর্তে যখন এই লেখাটি লিখছি আমি, তখন এ-হতে পারে বাংলাদেশের সদ্যনিহত মুক্তমনা অভিজিৎ রায়েরও আশাবাদী স্মৃতিতর্পণ। দেশে দেশে কালে কালে বাক্‌বোধ করার চেষ্টায় এই নৃশংসতা কীভাবে চলে, আর কীভাবেই-বা তার থেকে উত্তরণেরও একটা স্বপ্ন-আশ্বাস থেকে যায় দর্পিত মানুষের মনে, এ কবিতারই তুল্য তাঁর আরো কয়েকটি লেখার সেরকম উদাহরণও আমাদের স্মৃতিতে ফিরে আসে কখনো কখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন 'অজেয় লিপি' নামে ব্রেখটের সেই কবিতাটি, যেখানে আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ইতালীয় এক জেলবন্দীর কথা। জেলের দেয়ালে কপিং পেনসিল দিয়ে সেই বন্দী—সোশ্যালিস্ট এক সৈনিক—লিখেছিল : 'দীর্ঘজীবী হোন লেনিন।' জেলারের নির্দেশে এক বালতি চুন দিয়ে মুছে দেওয়া হলো সেই লেখা। মুছে গেল না তা, অক্ষরগুলিরই ওপর চুন বুলিয়েছিল বলে আরো জ্বলজ্বল করে উঠল লেখা। গোটা দেয়ালে তখন বুলিয়ে দেওয়া হলো চুন। চুন শুকিয়ে যেতেই আবারও ফুটে উঠল সেই লেখা। তখন এক ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তুলে নেওয়া হলো অক্ষরগুলি। ফলে দেয়ালে এবার গভীর করে খুঁড়ে তোলা সেই অক্ষরগুলিই পড়া গেল : দীর্ঘজীবী হোন লেনিন। তখন, সৈনিকটি বলে ওঠে 'এবার তবে দেয়ালটাকেই ভাঙো।'

কিংবা মনে পড়ে আরো একটি কবিতার কথা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কবির মৃত্যু'। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময়ে গুলি করে মারা হয়েছিল যে লোরকা-কে, তাঁর স্মরণে লেখা সেই কবিতাতেও ছিল ওইরকমই এক অজেয়তার কথা। হাতে শেকল বেঁধে এক কবিকে বধ্যভূমির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে কয়েকজন সেপাই। কবির হত্যাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে সমবেত জনতা। সেপাইরা উঁচিয়ে আছে রাইফেল। জনতা থেকে চিৎকার উঠেছে : 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' অস্ফুট হৃষ্টতায় কবিও বলেছেন 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক/মানুষের মুক্তি আসুক। আমার শিকল খুলে দাও।' কিন্তু তাঁকে করা হলো গুলি। প্রথম গুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কবি হাসলেন। দ্বিতীয় গুলিতে বুক ফুটো হয়ে গেল, তৃতীয় গুলি ভেদ করে গেল তাঁর কণ্ঠ—কিন্তু তবু কবি বলছেন শান্তভাবে 'আমি মরব না।' চতুর্থ গুলিতে বিদীর্ণ হলো কপাল, যে খুঁটিতে তাঁকে বাঁধা হয়েছিল, পঞ্চম গুলিতে মড়মড় করে উঠল সেটা। আর ষষ্ঠ গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল তার ডান হাত। আর কবি? মাটিতে পড়ে থাকা ছিন্ন হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে চাইলেন, 'বলেছিলুম কি না, আমার হাত শিকলে বাঁধা থাকবে না।'

ওই হাত এ মুহূর্তে অভিজিতের হাত। আর এই তিনটি কবিতারই নাম হতে পারে 'অজেয় লিপি।' এই তিনটি কবিতাই হতে পারে যে-কোনো দেশের কবিতা, ইতালির বা স্পেনের বা বাংলার—এই মুহূর্তে বাংলাদেশের। এই তিনটি কবিতাই হতে পারে যে-কোনো সময়ের কবিতা, প্রথম মহাযুদ্ধের বা স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের বা এ বাংলার নকশাল আন্দোলনের—এ মুহূর্তে বাংলাদেশের। কিন্তু তারও পরে, এই তিনটি কবিতাই হতে পারে উল্লিখিত ওইসব স্থান আর কালকে অতিক্রম করে যাওয়া যে-কোনো স্থানকালের কবিতা।

মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতাও, ঠিক সেইভাবেই, যে-কোনো স্থানকালের কবিতা হয়েই প্রবহমান থেকে যাবে পাঠকমনে। কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ পাঠকমনে নয়। সেই মনে, যে মন জীবনকে ছুঁতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরুরি অবস্থার আতঙ্ক

শারদীয় সংখ্যাগুলি ছাপানোর আয়োজন চলছে তখন, হঠাৎ একটা গুজব কানে এল, 'দেশ'-এ আমার কবিতা বেরোবে না এবার। সরকারি নিষেধাজ্ঞা। গুজবটার গুরুত্ব আছে, কেননা কোনো-একজন কথাটা শুনেছেন সুনীলের কাছে। কিন্তু সত্যি হতে পারে সেটা? কবিতা তো চেয়েছিলেন সাগরময় ঘোষ। জরুরি অবস্থার চাপে তেমন কিছু ঘটে থাকলে তিনিই তো আমাকে জানাতেন?

নিজেদের তখন টেলিফোন ছিল না। নীচের দোকানঘরে গিয়ে ফোন করছি সাগরদাকে : 'একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি—', কথাটা শেষ করতে না দিয়ে উনি বললেন 'যা শুনছ তা সত্যি। সংকোচে আমি জানাতে পারছিলাম না তোমাকে। দেশ-আনন্দবাজার দুটো পত্রিকার কবিতাই রাইটার্স থেকে ফিরে এসেছে না-ছাপানোর নির্দেশ নিয়ে। দুটোই তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্য দুটো লেখা পাঠিয়ে দাও। সময় তো বেশি নেই আর।'

শান্তভাবেই জানাই তাকে : 'অন্য কোনো কবিতা তো পারব না পাঠাতে। কেননা যা-কিছু লিখছি এখন, তার সবটাই তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও-রকম সরকারি হুকুম নিয়ে ফিরে আসতে পারে। এবার বরং থাক।'

পরদিনই পেয়ে গেলাম কাপড়-মোড়া কবিতাদুটির প্যাকেট, ওপরে বেশ বড়ো করেই সিলমোহর দেওয়া 'Not to be printed'। পেয়ে, আমার যে খুব খারাপ লাগল, তা নয়।

ছোটো পত্রিকাগুলি লেখা নেয় একটু দেরিতে। বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির মতো অগ্রিমতার প্রতিযোগিতা নেই তাদের, বৃহত্ত্বজনিত কোনো তাড়াও নেই। একে একে এবার আসছেন তাঁরা, লেখা দেবার সঙ্গে একটা শর্ত দিতে হয় তাঁদের যে রাইটার্সে পাঠানো চলবে না, ছাপতে হলে একটু ঝুঁকি নিতে হবে।

ইতস্তত করে পিছিয়ে যান অনেকেই।

এরই মধ্যে এল একদিন স্নেহভাজন বার্ণিক রায়। তার 'লা পয়েজি'-র জন্য এখনই একটা কবিতা চাই। একই কথা বলি তাকেও। সবসময়েই সপ্রতিভ বার্ণিক, বলে :'ওটা কোনো সমস্যা নয়। আমি যেখানে আছি তার একতলাতেই থাকেন বড়ো-এক সরকারি আধিকারিক , তাঁর সূত্রে আমি ব্যবস্থা করে নেব।'

'তাহলে আর পাচ্ছ না লেখা। কাউকেই দেখাতে পারবে না, ছাপতে হলে ঝুঁকি নিয়েই ছাপতে হবে, কেবলমাত্র সেই শর্তেই পেতে পারো কবিতা।'

একটুখানি ভেবে নিয়ে বার্ণিক বলে 'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি দেখাব না কাউকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনে রেখো, শাস্তিবিধান হলে তা কিন্তু কেবল লেখকের নয়, সম্পাদকেরও।'

আরো একটু ভেবে, বলে সে 'ঠিক আছে। নেব ঝুঁকি।'

'রাধাচূড়া' নামের একটি কবিতা নিয়ে চলে গেল বার্ণিক। আর তার কদিন পরেই কবিতা চাইতে এলেন আমাদের বন্ধু অরুণ সেন, 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকাটির সম্পাদক তখন তিনি। তাঁকেও বলি ওই একইরকম কথা, কিন্তু অরুণ তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছতায় স্মিত হাসিতে বলেন 'কী আর হবে, বড়ো জোর জেলে নিয়ে যাবে। দিন তো লেখাটা।'

এইভাবে ছাপা হয়ে গেল 'আপাতত শান্তিকল্যাণ'টাও। কিন্তু এসব মুদ্রণের ফলে আমাকে বা আমার সম্পাদকদের কাউকেই জেলে যেতে হয়নি। শুধু সরকারি চিহ্ন দেওয়া ওই প্যাকেটটি আমার কাছে রয়ে গিয়েছিল যত্নরক্ষিত এক সামগ্রীর মতো।

এর প্রায় বছরখানেক পরে, ইন্দিরা গান্ধী একবার এসেছেন কলকাতায়। শিল্পীসাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করতে চান বলে রাজভবনে আহ্বান এসেছে চা-পান সহ এক বৈকালী বৈঠকের জন্য। বিদেশবাসী অলোকরঞ্জন কিছুদিনের জন্য তখন দেশেই। সে এসে জিজ্ঞেস করে : 'যাচ্ছেন তো আপনি?' উত্তরে একটা সটান 'না' শুনে বলল অলোক 'আমি কিন্তু যাচ্ছি। কিছু কথা-শোনাবার এই সুযোগ ছাড়ব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে, অলোকেরই কাছে শোনা বিবরণে জেনেছি, সে-বৈঠকের আলাপচারিতে সুযোগ হয়েছিল কিছু সওয়াল-জবাবের। ইন্দিরা গান্ধী নাকি কথাপ্রসঙ্গে বলেন, কোনো কোনো বানানো বা অতিরঞ্জিত খবরপ্রকাশে বাধা দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এ-তথ্য ঠিক নয় যে দেশে কোথাও কোনো সৃষ্টিশীলতার ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। প্রতিবাদে অলোক বলে ওঠে অবশ্যই তা হয়েছে, এবং সেটা এই রাজ্যেই। ইন্দিরা তখন নাকি পাশে-বসা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন 'এ ইনি কী বলছেন?' জোরালো উত্তরে সিদ্ধার্থ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন : 'না না, এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই।' তারপর, অলোকের দিকে ফিরে একটু রুষ্টভাবেই : 'আপনার লেখা নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়েছে?'

'না, আমার লেখায় হয়নি। আমার বন্ধুর কবিতায় হয়েছে। ছাপানো যাবে না, এই নির্দেশ-সুদ্ধ ফেরত পাঠানো হয়েছে।'

রুষ্টতর স্বরে 'কোনো প্রমাণ দিতে পারেন?'

'অবশ্যই পারি।'

'পাঠিয়ে দেবেন তো আমার দপ্তরে। দেখতে চাই আমি।'

একটু জোর করেই আমার কাছ থেকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অলোক পাঠিয়ে দিয়েছিল 'Not to be printed'-ছাপদেওয়া সেই প্যাকেটটি। বোঝাই যায়, নিরর্থকই ছিল সেটা। মাঝখান থেকে আমার এমন স্নিগ্ধ স্মৃতিসামগ্রীটি চিরদিনের মতো হাতছাড়া হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো একবছর পর, অ্যাকাডেমিতে গিয়েছি কোনো-একটা অনুষ্ঠানে। মধ্যবর্তী বিরতিকালে বাইরে বেরিয়ে নানাজনের ভিড়ের মধ্যে আছি, হঠাৎ সংস্কৃতিজগতের বিশিষ্ট একজন—আমার স্নেহভাজন—এসে বলে : 'এদিকে একটু নিরিবিলিতে আসবেন? কথা ছিল একটা।'

নিরালা এক কোণে সে নিয়ে চলল আমায়। 'কী ব্যাপার? এত গোপনতা কিসের?'

'আপনার কাছে আমার একটা অপরাধ স্বীকার করার দরকার আছে। না বলতে পারলে ঠিক শান্তি পাচ্ছি না।'

'অপরাধ? কিসের অপরাধ?'

'হ্যাঁ, অপরাধই। আসলে কী হয়েছিল, ওই যে আপনার কবিতাদুটোকে সেন্সর করা হয়েছিল, তার জন্য প্রকারান্তরে আমিই কিন্তু দায়ী।'

'সে কী! কী ভাবে?'

'আমরা তখন সাময়িকভাবে সরকারের যে-দপ্তরে ছিলাম, তার প্রধান ছিলেন তখন গোপাল ভৌমিক। প্রকাশযোগ্য কিনা পরীক্ষা করার জন্য বিস্তর লেখাপত্র জমা পড়ত সে-দপ্তরে। সবটাই তো গোপালদার পক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না, তাই আমাদের কয়েকজনকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল কাজ। বলা ছিল, যে-লেখাগুলির বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সংশয় দেখা দেবে, কেবল সেইগুলিই তাঁকে দেখাতে। আমার দায়িত্ব ছিল কবিতা পড়ার। আপনার লেখাদুটো পড়ে প্রথমে মনে হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ আর কতজনে বুঝবে! কিন্তু তারপরেই ভয় হলো, যদি গোপালদা কোনো অসুবিধেয় পড়েন, তার জন্যে তো দায়ী করবেন আমাকেই। ওঁকে কি বিপদে ফেলব? এইসব ভেবে কবিতাদুটো ওঁকে দেখাই। উনি দেখলেন, ভাবলেন অনেকক্ষণ, তারপরে বললেন—না, এ ছাপা বোধহয় ঠিক হবে না। তখন পড়ল সরকারি সিলমোহর : Not to be printed! আর সেই থেকে মনে মনে খুব কষ্টে আছি। আপনাকে বলতে পেরে একটু হালকা হলাম আজ।'

ওকে আশ্বস্ত করে বলি 'এতে তোমার কী দোষ? তুমি তো কেবল তোমার কাজের দায়িত্ব পালন করেছ। এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই।'

'তবুও, মনটা ভারাক্রান্ত লাগে। এর একটা প্রায়শ্চিত্ত আমি করে গেছি বছরখানেক ধরে। দিল্লিতে বা কলকাতায় যখনই সুযোগ পেয়েছি, ওই কবিতাদুটো আবৃত্তি করে শুনিয়েছি।'

নিরালা থেকে আমরা সরে আসি সমাবেশের দিকে।

সেইদিনটার আগে পর্যন্ত যে ছিল আমার এক পরিচিতজন মাত্র, তার পর থেকে আজও পর্যন্ত সে আমার স্নেহভাজন অতিনিকট এক বন্ধু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

কিন্তু কবিতা সত্যি সত্যি কতটুকু কাজ করে? কিছু কি করে?

সেই সময়টাতেই, এ প্রশ্ন তুলে আমাকে সধিক্কার এক ছন্দোবদ্ধ চিঠি লিখেছিলেন একজন গুণী মানুষ। সে-ধিক্কারে অবশ্য মেশানো ছিল একটা অভিমান।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর স্বভাবতই একটা আলোড়ন জাগে গোটা দেশ জুড়ে। মতপ্রকাশের বা লেখার স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চাই লেখারই মধ্য দিয়ে। এ নিয়ে নানারকমের প্রস্তাব আর আয়োজন চলছে নানা দিকে। আমিও আছি সেই উত্তেজনায়। শুনতে পাচ্ছি গৌরকিশোর ঘোষ আর জ্যোতির্ময় দত্ত বড়োসড়ো এক প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে তুলছেন, অন্য আরো আরো কাউকে যুক্ত করতে চাইছেন সেই পরিকল্পনায়। হয়তো-বা আমাকেও।

সকলেই জানেন যে রাজনৈতিক দল হিসেবে সি. পি. আই. ছিল জরুরি অবস্থার সমর্থক। আমাদের অনেক বন্ধুই তাই মেনে নিতে পারছিলেন না এইসব আয়োজন, এর মধ্যে তাঁরা দেখছিলেন একটা-কোনো মার্কিনি অভিসন্ধি। শুভার্থী হিসেবে একদিন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে হাজির, খুবই নম্রভাবে আমাকে বোঝাতে থাকেন প্রতিবাদের অযৌক্তিকতা, ভেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে বলেন একটু। দু-একদিনের মধ্যে আসে আরেকজন, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, সে বলে : 'তোমার কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার বলবার কিছু নেই। কেবল, যা করতে চাও, একলা কোরো। কারো সঙ্গে মেলা বোধহয় ঠিক হবে না।' তাকে আমি আশ্বস্ত করে জানাই, দলবদ্ধ হবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। নিজের পক্ষে সাধ্য যতটুকু, সেটুকুই করব, যা বলার বলব আমার কবিতায়।

কিন্তু কবিতা কতটুকু কাজ করে? কিছু কি করে?

জরুরি অবস্থা ঘোষণার অল্পদিনের মধ্যেই—৬ অক্টোবর ১৯৭৫— মিসায় কয়েদি হলেন প্রতিবাদী গৌরকিশোর ঘোষ, আর ধরা না দিয়ে গোপন কাজ সম্পন্ন করবার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছেন জ্যোতির্ময় দত্ত। কারাবাসের প্রায় একবছর পর—৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬—আমার উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে গৌরকিশোর পাঠালেন তাঁর ছোটো মেয়ের কাছে, আমার হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে। পৌঁছেও গেল। আজ এতকাল পরে, ঠিক যোগ্য সময়ে (জুন ২০১৫), সেই কবিতা আর কারান্তরাল থেকে লেখা তাঁর সমস্ত রচনা নিয়ে একটি বই বেরোল : 'দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন গৌরকিশোর, আমার কাছে রাখা তাঁর নিজের হাতের লেখায় সেটা ছিল এইরকম

এই কি নিয়তি
(কবি শঙ্খ ঘোষ, প্রিয়বরেষু)

তবে কি নিয়তি এই—
কবিতার শবাধারে, পুষ্পের গোপনে
সব শব্দ তুলে দেব?

কতটা চতুর আমি কত বা কৌশলী
শব্দ ব্যবহারে
রেখে যাব তারই কিছু করুণ প্রমাণ?

গদ্যের গাণ্ডীবে জ্যা
কখনোই যোজনা করব না?
কখনোই
লক্ষ্যবেদী শব্দের সুতীক্ষ্ণ শর
ছুঁড়বো না? যেহেতু তা
স্থির লক্ষ্যে ছুটে যায় প্রকাশ্যেই
এবং সুচতুর চক্রজাল ছিন্ন ক'রে
মৎস্য চক্ষু বেঁধে?
যেহেতু টংকারে তার বজ্রের নির্ঘোষ,
ভেঙে দেয় মোহ নিদ্রা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায় ব্রতধারি,
বনবাসে আর কত দিন?
মোহনিদ্রা আর কত দিন!

শব্দের ধ্বনিমুগ্ধ
অর্জুন! অর্জুন!
এই বৃহন্নলা-বৃহন্নলা
ছলনার খেলা
শব্দ নিয়ে এই মিথ্যা লুকোচুরি খেলা
কত দিন, আর কত দিন!

বীর্যবন্ত শব্দের ভ্রূণ
যা হ'ত শত্রুঘ্ন শর
দুর্বার কঠোর
ক্রমাগত উপমার ব্যঞ্জনার
অচরিত্র অর্থহারা দিশাহারা পরিক্রমা শেষে
তবে কি পড়বে খসে
তূণেরই অতলস্পর্শী বন্ধ্যা অন্ধকারে?
কোনোদিনই দেখাবে না মুখ?
টংকার দেবে না কার্মুক?

অবিরাম নিষ্ফল ব্যায়ামে
শব্দ যদি ওজন হারায়
হৃত-অর্থ হয় ক্রীতদাস হয়
শব্দের ঠোকায় বিন্দুমাত্র স্ফুলিঙ্গও না
ওঠে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূন্যগর্ভ তবে সেই শব্দের আধারে
সেই শবাধারে
তুলে কি হবে না দিতে কবিতারও শব?

এই কি নিয়তি?

হায় ব্রতধারি, হায়!

কবিতাটিতে ব্রতভঙ্গের যে আহ্বান ছিল, বলা বাহুল্য যে সেটা আমি তাঁর মনোমতো পালন করতে পারিনি। আর তাঁর কারামুক্তির পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমাদের ঘনিষ্ঠ কথাবার্তায় এ নিয়ে কোনো প্রসঙ্গও তিনি তোলেননি কখনো। ধরেই নিয়েছিলাম যে আমার তখনকার কবিতাগুলি তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। সদ্যপ্রকাশিত বইটিতে মেয়ের কাছে লেখা বাবার চিঠিটা পড়ে কিন্তু একটা চমক লাগল। ৯ সেপ্টেম্বরের সেই চিঠিতে ওই কবিতাটি পাঠিয়ে প্রসঙ্গত গৌরকিশোর লিখেছেন 'শঙ্খের সাম্প্রতিক কয়েকটি কবিতা—দেশ এবং পূর্বাশা (আষাঢ়) পত্রিকায় প্রকাশিত (''হাতেমতাই'' আমি পড়িনি)—আমার ভালো লেগেছে। ওই কবিতা সেই প্রেরণা প্রণোদিত (তোমার খাতায় এটি লিখে রেখেছি)।'

আজ আর তাঁকে কিছু জানাবার উপায় নেই আমার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

সেই দিনগুলিতে, অন্য সব সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের মতোই, আকাশবাণীরও বাণীর ওপর খড়্গ নেমে এসেছিল, তা সবাই জানেন। কাজকর্মে সে-দুর্বিপাক কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল, অবিশ্বাস্য কয়েকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমিও কিছু আন্দাজ পেয়েছি তার। বুঝেছি, নিষেধসম্ভাবনার আতঙ্কটাই কতখানি গ্রাস করেছিল সেদিন।

দূরদর্শনের সেটা ছিল সূচনামুহূর্ত। তারই জন্য একটি অনুষ্ঠান তৈরি করে দিতে হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন আর অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সান্নিধ্যগত সূত্রে। দূরদর্শনের নিজস্ব ধ্বনিধারণযন্ত্র তৈরি হয়ে ওঠেনি তখনও, তাই কথা বা গানের ব্যবস্থা করে নিতে হতো আকাশবাণী ভবন থেকেই। একদিন সারাবেলা জুড়ে চলছে সেই রেকর্ডিং 'জন্মদিন মৃত্যুদিন'।

মাঝখানে একবার, অনুষ্ঠানটির প্রযোজক পঙ্কজকে খানিক উশখুশ করতে দেখে জিজ্ঞেস করি 'কিছু কি বলবে?' একটু আড়ালে টেনে নিয়ে জানায় সে 'হ্যাঁ, জরুরি একটা কথা। অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালা থেকে যে-টুকরোটা নীলাদ্রি পড়লেন, ওটা কি একটু পালটানো যায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই ছিল সঙ্গেই। বললাম 'অবশ্যই যায়। কিন্তু যা আছে তাতে কি অসুবিধে হচ্ছে কিছু?'

'স্টেশন ডিরেক্টর বলছেন ওটা বদলে দিলে ভালো হতো।'

'কেন বলছেন? ওটায় কী অসুবিধে সে তো আগে বুঝতে হবে আমার।'

কোনো উত্তর দেয় না অধোবদন পঙ্কজ।

মজাদার সে-জায়গাটায় সংলাপ ছিল অনেকটা এইরকম : 'তখন ইন্দ্রের ভয়ে ঘরে কুলুপ দিয়েছেন ব্রহ্মা।'

নিরুত্তর পঙ্কজকে মস্ত একটা ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলি : 'তোমার স্টেশন ডিরেক্টর নিশ্চয় ইন্দ্রকে ইন্দিরা ভাবছেন না?'

আমাকে পরম বিস্মিত করে উদ্ভাসিত পঙ্কজ বলে 'ঠিক তাই। উনি বলছেন শ্রোতারা ওখানে ভুল করে অন্যরকম শুনতে পারে। ইন্দিরা গান্ধীকেই আক্রমণ করা হচ্ছে বলে ভাবতে পারে। তাতে বিপদ।'

সত্যি তো! কেবল তো ইন্দ্র নয়, ইন্দ্রের ভয়, তার ওপর আবার ঘরে দিচ্ছে কুলুপ। এসব কি বলা যায় জরুরি অবস্থার সময়ে?

পরের ঘটনাটা রেডিয়োরই নিজস্ব। কোনো-একটা প্রসঙ্গে মিনিট পনেরো বলতে হয়েছিল আমাকে। স্ক্রিপ্টটা অগ্রিম দেখে নেবার ওঁদের ধরাবাঁধা রীতিটার তখন আর প্রয়োগ হয় না আমার ওপর, হাজির হতেই চটপট সাঙ্গ হল রেকর্ডিং। কাচের আড়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে দেখতে পাচ্ছি প্রযোজকের মুখ একটু গম্ভীর হয়ে এল। বেরিয়ে আসার পর বলেন তিনি 'যে-কটা কবিতার লাইন দিয়ে শেষ করলেন, সেটা কিন্তু বাদ দিতে হবে।'

চমকে উঠি আমি। 'সে কী! ও তো জীবনানন্দের লাইন। ওটা বাদ দিলে তো লেখাটা শেষদিকে অর্থহীন হয়ে যাবে।'

লাইনগুলি ছিল

মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি ;

প্রযোজক বলেন 'আপনি বরং কেবল জীবনানন্দেরই অনেকগুলি কবিতা একদিন পড়ে দেবেন একসঙ্গে, সেইরকম একটা প্রোগ্রাম করে দেব। এইটা ছেড়ে দিন।'

'জীবনানন্দের কবিতা রেডিয়োতে পড়ে দেবার জন্য আমি যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি তা নয়। কিন্তু এখানে ও-লাইনকটা না হলেই চলবে না। কেন, আপনার সমস্যা হচ্ছে কোথায়?'

একটু ইতস্তত করে বলেন উনি : 'ওই রক্তের জায়গাটায়।'

'মানে? রেডিয়োতে কি এখন রক্ত শব্দটাই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে?'

আর তিন নম্বরটা ঘটল আরো কমাস পরে। বিভাগীয় দায়িত্বে তখন আছেন আমাদেরই বন্ধু কবিতা সিংহ। তাঁরই জেদে রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে একটি ভাষণপাঠ সাঙ্গ করে বেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছি আকাশবাণী ভবন থেকে, সৌজন্যবশে রাস্তার ওপর ফুটপাথ পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছেন কবিতা। বিদায় নেবার মুহূর্তে অসীম কোমলতায় কবিতা বলেন 'একটু কিন্তু এডিট করে দেব লেখাটা, কেমন?'

'এডিট?' মাথা ঘুরে যায় আমার। 'কোথায়? কেন? আগে বললেন না কেন?'

'বলবার মতো কিছু না। সামান্যই ব্যাপার। ও আমি করে দেব, আপনি টেরও পাবেন না।'

'আমার লেখা খানিকটা এডিট করে দিলেন আর আমি টেরও পেলাম না—লেখা বা আমি কারো পক্ষেই সেটা ভালো কথা নয়। কিন্তু করতেই যদি হয় তো আমিই করব। কোথায় কী করতে হবে?'

'আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের তো এত গল্প আছে, এত লাইন আছে। শেষ দিকটায় ওই লাইনগুলি ছাড়া আর কি কিছুই মনে পড়ল না আপনার? ভাবুন তো, এ-সময়ে ওসব কথা কি রাখা যায়?'

''মেঘ ও রৌদ্র'' গল্প থেকে নেওয়া সেই লাইনকটি ছিল এ-রকম

> শশিভূষণ...কহিলেন, 'জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর, যদি সৎসঙ্গের কথা বলো তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত—বাহিরে অনেক বেশি।'

কবিতাকে তখন বলি : 'বাদ যদি দিতেই হয় পুরো লেখাটাই বাদ দেবেন। কিন্তু শুধুমাত্র ওটা পালটাতে পারবেন না।'

'বন্ধুকে এভাবে বিপদে ফেলবেন?'

'ফেলব না। আমার খুব বিশ্বাস আছে যে কিছুই বিপদ হবে না এতে।'

শেষ পর্যন্ত, হয়ওনি কোনো বিপদ। শুধু বিপদের ভয়টা সেদিন ছড়ানো ছিল হাওয়ায় হাওয়ায়।

একটা কথা অবশ্য এখানে কবুল করা উচিত। অবনীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের উদ্ধৃতি ব্যবহার করবার সময়ে স্বতন্ত্র কোনো মতলব কাজ করেনি মনে, লেখার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল অংশগুলি। কিন্তু ''মেঘ ও রৌদ্র'' থেকে ওই লাইনগুলির প্রয়োগকে নিছক নিরপরাধ বলা যায় না। জেলের বাইরে গোটা দেশটাই যে তখন জেলখানা হয়ে আছে, আলোচনার ছলে সেই কথাটারই উচ্চারণ করতে চেয়েছিলাম সেদিন। কবিতা, স্বভাবতই, বুঝেছিলেন তা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেডিয়োর সঙ্গে সম্পর্ক

মফস্বল শহরে রেডিয়ো এসে পৌঁছচ্ছে, এর মজাদার এক কৈশোরস্মৃতি আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল মধুমাস' নামের কবিতাটিতে। এস ডি ও-র বাংলোয় রেডিয়ো নিয়ে এসেছেন তাঁর জামাই, সেটা দেখে শুনে ধন্য হবার জন্য গণ্যমান্য থেকে শুরু করে 'শহরের মশামাছিটিও' আমন্ত্রিত সে- বাংলোয়। কিন্তু অন্যভস্ত হাতে নতুন যন্ত্র চালাতে গিয়ে 'এ-কল সে-কল এ ছুঁই তা ছুঁই' করতে করতে 'গলদ্‌ঘর্ম এস ডি ও-র জামাই বেচারি'। আর শেষ পর্যন্ত তার সেই ব্যর্থতা দেখে একদল বেশ খুশি, অন্যেরা কেউ-বা এর জন্যে সরকারকেই দেয় দুয়ো, কেউ-বা বলে 'এ থেকেই বোঝা যায়/ রেডিয়ো ব্যাপারটাই হল ভুয়ো'!

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই স্মৃতিকালের একযুগ পরে ছিল আমাদের কৈশোর। নতুন যন্ত্রের অতখানি চমৎকৃত হওয়া কিংবা তাকে ভুয়ো বলে সন্দেহ করাবার সময় তখন পেরিয়ে গেছে অনেকটাই। কিন্তু তবুও, গ্রামে বা মফস্বলে রেডিয়ো তখনও বেশ দূরের স্বপ্ন। ছোটো একটা শহরে একটি বা দু'টি রেডিয়োর ক্বচিৎ কখনো খবর পাওয়া যায় হয়তো। যে রেলওয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলোনিতে ছিল আমাদের বাস, সেখানকার অফিসারপাড়ার একটি-কোনো বাড়িতে তার অস্তিত্ব ছিল ঠিকই, কিন্তু সেসব অগম্য জগতে পৌঁছবার বড়ো একটা সুযোগ হতো না আমাদের। শুধু, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা থাকলে অনেকে মিলে ছুটে যাওয়া যেত রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সামনে, ইনস্টিটিউটের সর্বজনীন রেডিয়ো থেকে শুনে নেওয়া যেত খেলার ধারাবিবরণী, তখনও পর্যন্ত শুধু ইংরেজিতেই। স্বাধীনতার পরেও, কলকাতায় পৌঁছেও কতদিনই-না কোনো-না-কোনো সেলুনের সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছি সেসব, ক্রিকেটের বা ফুটবলের উত্তেজনায়। শুনেছি, কীভাবে আস্তে আস্তে ইংরেজি থেকে একদিন বাংলায় গড়িয়ে এল 'রিলে', পিয়ার্সন সুরিটা বা বেরি সর্বাধিকারী থেকে কমল ভট্টাচার্য বা অজয় বসুদের যুগে।

কিন্তু তবুও, ফুটবল বা ক্রিকেট নয়, আমার প্রথম অন্তরঙ্গ রেডিয়োস্মৃতির সঙ্গে জড়ানো আছে একটা দক্ষিণি সুর, আর স্বাধীনতার স্বাদ।

২

ছেচল্লিশ সালের আগস্টে কোনো দাঙ্গা হয়নি আমাদের ছোটো শহরটায়। হয়নি, কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে কিছু ঘটে যেতে পারে, এমন একটা চাপা আতঙ্কে তখন থমথমে করছে চারদিক। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতঙ্কে, একমাসের জন্য আমরা ছিলাম পরবাসী। ইস্কুলপাড়া ছেড়ে অফিসারপাড়ার সুরক্ষণে, তরুণ এক মাদ্রাজি অফিসারের বাংলোয়। একা থাকেন বলে বড়ো সেই বাংলোর অনেকটা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের। সারাদিনের কাজের শেষে একলার ঘরে ফিরে এসে বিশ্রাম নেন তিনি রেডিয়ো চালিয়ে দিয়ে। ইলেকট্রিক পাখা, ইলেকট্রিক আলো আর পাশের ঘর থেকে ওই রেডিয়োর ধ্বনি— সব জড়িয়ে মনে হয় যেন কোনো অলৌকিক দেশে আছি আমরা। দেয়াল টপ্‌কে ভেসে আসছে গান, কিন্তু তা কলকাতা কেন্দ্রের নয়, সবই তার দক্ষিণি সুর, দক্ষিণি গলা। মনে মনে তাই সেই সুরেরই একটা স্থায়ী যোগ থেকে যায় সন্ধেবেলার সঙ্গে, আর রেডিয়োরও সঙ্গে। আগেপরে সেই সুর, তার মধ্যে থাকত খবর, ইংরেজি খবর। সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস, প্রতিদিনই তখন কাটছে নতুন সম্ভাবনায়, কিংবা সম্ভাবনার নতুন নতুন বিনাশে। সে খবর কি কাগজেও থাকত না? থাকত, তবু অনেক বেশি তাকে জ্যান্ত আর সম্পৃক্ত লাগত খবর বলার স্বরে। উত্তেজনার সেই স্বরে এই শুনছি দেশীয় নেতাদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গড়ে দিচ্ছে ব্রিটিশরাজ, কে কোন্ দপ্তর পাচ্ছেন শুনছি তার তালিকা, আবার এই শুনছি দুদিন পরে যে মুসলিম লিগ যোগ দেবে না সেই সরকারে। বাবার সঙ্গে বসে রাজনৈতিক আলোচনা করেন মাদ্রাজি যুবা, লক্ষ করি রেডিয়ো -সংবাদ থেকে জেগে-ওঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের উদ্‌বেগ আর বিচার, অস্পষ্ট আভাস পাই আসন্ন কোনো পালাবদলের। কয়েকদিনের মধ্যে জিন্না আবারও ভয় দেখান গৃহযুদ্ধের। রেডিয়োর সামনে আবারও শুরু হয় তর্কবিতর্ক।

স্বাধীনতা এর ঠিক এক বছর পরের কথা। আর সেই স্বাধীনতার সময়ে, আরো একবার রেডিয়ো-সান্নিধ্যে এল আমাদের জীবন, আরো একটু অন্তরঙ্গতায়। কেননা, দেশভাগের মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে এবার আমরা আছি গুয়াহাটিতে কাকার বাংলোয়। রেলওয়ে কর্তা তিনি এবং অবশ্যই এক রেডিয়োর গর্বিত অধিকারী। এখন আর শুধু সন্ধ্যাবেলা নয়, সকালদুপুররাত যে-কোনো সময়েই রেডিয়ো আমাদের সঙ্গী হতে পারে। হারমোনিয়াম আর খাতাকলম নিয়ে রবিবারে বোনেরা বসে থাকে উৎকর্ণ, সংগীতশিক্ষার আসরে পঙ্কজকুমার মল্লিক শেখাবেন গান। স্বাধীনতাকালের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো থাকে তাঁর স্বর, কেননা সময়ের সঙ্গে সংগতি রেখে তখন তিনি শেখাচ্ছেন 'ওরে নূতন যুগের ভোরে/ দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে' কিংবা 'নাই নাই ভয় হবে হবে জয়/ খুলে যাবে এই দ্বার'।

কিন্তু ভোরের বেলায় সেসব উন্মুখতার চেয়ে অনেক বেশি ভাস্বর হয়ে থাকে চোদ্দই আগস্টের রাত। রেডিয়ো ঘিরে বসে আছি সবাই, যেন ওটাই মধ্যে আছে সব জাদু। বাইরে ঝলমল করছে শহর। তোরণে মালায় বাজিতে আলোয় সচল প্রবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাহ। আর ঘরের মধ্যে রেডিয়োর সামনে আমরা ক-জন স্থির। বাজল বারোটার ঘণ্টা, রেডিয়োরই মধ্য থেকে জাগল সেই ধ্বনি। বাইরে দিকে দিকে বেজে উঠল শাঁখ, ভিতর থেকে শোনা গেল নেহরুর আবেগভরা গলা : এই মধ্যরাতে পৃথিবী যখন ঘুমন্ত, ভারত তখন জেগে উঠছে জীবনে, স্বাধীনতায়।

এর চেয়ে বড়ো মুহূর্ত কি আর হতে পারে কিছু? অথচ তাকিয়ে দেখি বড়োদের চোখে জল। কঠিন দীর্ঘ প্রতীক্ষাশেষে সফলতার তৃপ্তি একরকম জল এনে দেয় চোখে, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু রেডিয়োর সেই ধ্বনি সেদিন যে-জল ঝরিয়েছিল সে তো কেবল সফলতার নয়, পরম এক বিফলতারও। বিফলতা, কেননা টুকরো হয়ে গেছে আমাদের দেশ। বিফলতা, কেননা আমাদের নিজেদের গ্রামের এখন ভিন্ন এক দেশপরিচয়। বিফলতা, কেননা রেডিয়োহীন সেই আমাদের গ্রামের বাড়িতে দাদু-ঠাকুমা এই মুহূর্তে কী করছেন, তা আমরা জানি না।

কলকাতায় এসে পৌঁছলাম তারপর। তার দোকানে-দোকানে রেডিয়ো, পথে দাঁড়ালেই শুনে নেওয়া যায় অনুরোধের আসর কিংবা ফুটবল-ক্রিকেটের রিলে।

৩

পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে, ভাইয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর, ওর স্কলারশিপের টাকায় নিজেদেরই একটা রেডিয়ো হলো আমাদের। পথেঘাটে ঘুরতে হবে না আর। একখানা মাত্র ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকগুলি মানুষ, সেইখানে ওই রেডিয়ো— কাকা এসে বিরস মুখে বলেন 'এ-বাড়িতে লেখাপড়ার পাট তবে উঠল!' খুব কিছু অন্যায় নয় ভাবনাটা। সূচনা থেকে শুরু করে রাত্রিবেলার যতিপাত পর্যন্ত প্রায় সবসময়েই খোলা থাকে নতুন- পাওয়া যন্ত্র, সারাদিন ধরে কত যে বকমবকম তার। খবরের সাহিত্যের গানের, গান শেখানোর রান্না শেখানোর চাষবাসের কত-না রকম-রকম কাণ্ড। মহিলামহল অনুরোধের আসর পল্লীমঙ্গলের আসর গল্পদাদুর আসর আর সেই 'ছোট্ট সোনা ভাইবোনেরা, আমার আদর আর ভালোবাসা নাও— ভালো আছো তো সব?' বলে 'আমি তোমাদের ইন্দিরাদি'র সাপ্তাহিক ডাক! এর মধ্যে পড়া হবে কখন?

ঠিকই। কিন্তু কাকা জানতেন না যে ওইসব শব্দতরঙ্গে আমাদের কারো কারো পড়াশোনার বরং সুবিধেই হয়, মনোযোগ গাঢ় করবার জন্য স্তব্ধ রেডিয়োকে বরং সচলই করে দিই অনেকসময়ে। মা হয়তো বলেন 'ও আবার কী ঢঙ? পড়ার সময়ে রেডিয়ো কিসের?' বুঝিয়ে বলি যে ঘরের এতসব এলোমেলো শব্দকে ঢেকে দিতে পারে যন্ত্রগত ওই একক শব্দ, একটা আবরণেরই পটভূমি তৈরি হয়ে ওঠে তখন, বেশ মন লাগে পড়ায়।

নিজেদের রেডিয়ো হবার সবচেয়ে সুবিধে হলো আয়েস করে মহালয়া শোনার। সমবেতভাবে ঘুম ভাঙানো হয় সকলের, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবেশধরানো তরঙ্গমন্দ্রিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারণ শুনতে শুনতে শুয়ে থাকা যায় দিব্যি, আর তারই মধ্যে কখন আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার আরাম। সান্নিধ্যে না থাকলে কি এতটা হতো?

একটাই শুধু মুশকিল হলো এই অতিসান্নিধ্যে। জীবনের উচ্চাশা বিষয়ে ধারণাটাই গেল পালটে। মনে হলো আকাশবাণীর ওই ধারণবাক্সের মধ্যে ঢুকতে পারাটাই হলো এ-জীবনের চরিতার্থতা। শুনেছি প্রেমেন্দ্র মিত্র বা লীলা মজুমদারের মতো মানুষেরা ওখানে পরামর্শ দেবার নানা কাজ করেন। সে-খবরে তত যে চঞ্চল হই তা নয়। কিন্তু যখন নানা সূত্রে শুনতে পাই বিকাশ রায় বা বসন্ত চৌধুরীদের গলা, তখন একেবারে অভিভূত থাকি। সাব্যস্ত করি যে কাজ যদি করতেই হয় তো সেটা আকাশবাণী কলকাতায়। কখনো কি সম্ভব হবে সেটা?

সে-সম্ভাবনার বিপদের দিকটাও অবশ্য টের পাওয়া গেল অচিরে। রেডিয়ো খোলা থাকলে মাঝে মাঝেই চমকে ওঠেন বাবা। কেবলই দেখি তাঁর শিক্ষকসত্তায় মোচড় লাগে। 'এই দেখো কাণ্ড, এই একটা শব্দ বলল, ভুল। ওই একটা উচ্চারণ হলো, ভুল। এ কি একটা বাক্য হলো? ছিঃ! ভাষার জন্য দরদ নেই কারো?' এইসব আক্ষেপে-বিক্ষেপে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে পরিবেশ! কথা শোনাতে গেলে এতসব ঝঞ্ঝাট? ঘরে দেখি বাবার এই বিষাদ, কাগজে পড়ি পরিমল গোস্বামীদের মতো কারো কারো ধিক্কার। বাবাও অবশ্য প্রকাশ্যেই লিখবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে : 'বেতারে কতবার যে ''আমাদের মহান নেত্রী' শুনেছি, তার সীমাসংখ্যা নেই। ''নেত্রী'' যখন ''মহান্'' হয়েছেন তখনই আশঙ্কা করেছি ''মহতী বিনষ্টিঃ'' সম্মুখে। আমরা রাজনীতির কথা বলছি না, ভাষার কথাই বলছি।'

এসব পড়ে এসব শুনে, রেডিয়োতে কথা বলার ইচ্ছেটা লুপ্ত হয়ে গেল। এ তো দেখছি প্রতিদিনের পরীক্ষা। হাজার হাজার সচেতন মানুষের কান নিয়তই নিয়ে চলেছে সে-পরীক্ষা, তার সামনে না-দাঁড়িনোই ভালো।

৪

একদিন তার দীর্ঘ একটি লেখন এগিয়ে দিয়ে অলোক এসে বলে : 'এই-যে, এই অনুষ্ঠানটা আমরা করব রেডিয়োর জন্য।' দান্তের সাতশো বছরের জন্মদিনকে মনে রেখে একটি আলেখ্য তৈরি করেছে সে 'অমৃতধামযাত্রী'। ইনফার্নোর পঞ্চম সর্গ নিয়ে, পাওলো-ফ্রাঞ্চেস্কার প্রণয়কথা মনে রেখে দান্তে-ভার্জিল-ফ্রাঞ্চেস্কা আর বেয়াত্রিচের আশ্চর্য এক সংলাপমালা সেটা, কবিতায় গাঁথা। 'রেডিয়োতে হবে এটা? এতটা সময় নিয়ে? এমন কাব্যকথা? রাজি হবেন ওঁরা?' 'হবেন মানে? কথা তো হয়ে গেছে। এবার রেকর্ডিং।'

হলোও সে-গাথার সম্প্রচার, ১৯৬৫ সালের তিরিশে জুন। কয়েকমাস পরে প্রায় ওইরকমই আরেকটি ছিল গ্যোয়েটেকে নিয়ে (তখন অবশ্য 'গ্যেটেই বলতাম আমরা), তাঁর 'ফাউস্ট'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে রেখে। এমনসব অনুষ্ঠানের যে সাহস করতেন ওঁরা, সে কোন শ্রোতাদের ভরসায়? জানি না তো। শুধু এইটুকু জানি যে দাস্তে-অনুষ্ঠানের পর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরপথে, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতো মানুষ একদিন কী বলেছিলেন অলোককে। উনি চলেছেন কয়েকজনের সঙ্গে, একটু পিছনেই আমরা দু-জন, হঠাৎ দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে বলেন 'এই-যে অলোকরঞ্জন, আই ওয়ান্ট টু অ্যাড্‌মায়ার ইউ। কাল অনেক রাতে রেডিয়োতে হঠাৎ শুনি তোমার অমৃতধামযাত্রী। খুব উঁচুমানের কাজ।' তারপর, অন্যদের দিকে তাকিয়ে : 'শুনেছ তোমরা কেউ? কলকাতা রেডিয়োর সাহস আছে বলতে হবে। এসব লেখারও সম্প্রচার হয় ওখানে।'

সাহস করেছিলেন ওঁরা আরো। সন্ধের দিকে সংবাদ আর স্থানীয় সংবাদের মধ্যবর্তী পাঁচ মিনিটের বিরতিতে শুরু হলো এক সাহিত্যসমীক্ষার অনুষ্ঠান। ওই সময়ে? হ্যাঁ, ওই সময়টাতেই। কিছুদিন ধরে অলোক যে তার অলৌকিক অলংকৃত ভাষায় সাহিত্যের জটিল ভাবনাগুলিও বলতে পারল ওখানে, এরই থেকে বোঝা যায় সেই সাহস।

আর সেসব দিনের ঠিক পরপরই এল একাত্তরের দিনগুলি। সকাল দুপুর সন্ধে জুড়ে রেডিয়ো তখন সকলেরই প্রতিমুহূর্তের অবলম্বন। আর্তিতে আর আশায় তখন কাঁপছে সবার মন। এই শোনা যায় স্বাধীনতার ঘোষণা করছেন মুজিব। এই শোনা যায় রাতের অন্ধকারে ঢাকা চুরমার হলো পাকিস্তানি সৈন্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে। এই প্রতিষ্ঠা হলো বাংলাদেশের, এই প্রবর্তিত হলো তার স্বাধীন এক বেতারকেন্দ্র। সে-বেতারও শুনতে চায় সবাই, তবু এ-বাংলায় বা ও-বাংলায় সকলেই উৎকর্ণ থাকে কেবল 'আকাশবাণী কলকাতা'র ধ্বনিটুকু পাবার জন্য। সেই ধ্বনি, যা তরঙ্গিত হয়ে চলেছে প্রধানত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগকম্প্র স্বরে আর রোমাঞ্চিত করছে সবাইকে।

কিন্তু কেবলই তো স্বর নয়। যে-কথাগুলিকে তুলে আনে সেই স্বর, দৃপ্ততা আর স্বচ্ছতায়, মননে আর আবেগে, বিশ্লেষণে আর কাব্যময়তায় খুবই স্মরণীয় হয়ে থাকে সেগুলি। তা হয়ে ওঠে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য এক ইতিহাস। অনেকে তখন জানতামও না যে অত্যল্প সময়ের মধ্যে 'সংবাদ পরিক্রমা'র সেই কথাগুলি লিখে চলেছেন একজন প্রণবেশ সেন, দিনের পর দিন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকেই তাঁর হাতে শুরু হয়েছিল যে পরিক্রমা, নতুন এক মহিমায় তা উত্তীর্ণ হয়েছে তখন।

৫

রেডিয়োর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবার চিঠিতে অদ্ভুত একটা পদ্ধতি ছিল আকাশবাণীর। ছাপানো ফর্মের নির্দিষ্ট কোনো শূন্যস্থানে টাইপ করে এইভাবে হয়তো বলা হতো বিষয়টা এ সেল্‌ফ্‌-কম্পোজ্‌ড় পোয়েম অন দ্য ফলোয়িং টপিক। তারপর সেই টপিকের নাম। নির্দিষ্ট একটা 'টপিক' বলে দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা লিখবার বা পড়বার আমন্ত্রণ? হয়তো এতে দোষ নেই তেমন। অনুরোধও করেন অনেকে, লিখেও থাকেন অনেকে। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ আপত্তিকর ঠেকত। কয়েক মাসের মধ্যে বার চারেক প্রত্যাখ্যান করতে হলো এমনসব আহ্বান কখনো দ্বিশতবর্ষের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রামমোহন হন 'টপিক', কখনো স্বাধীনতার পঁচিশ বছর, কখনো-বা নব-উদ্ভূত বাংলাদেশ।

বলা বা শোনা, দুদিক থেকেই রেডিয়োর সঙ্গে যোগটা কমে আসে আস্তে আস্তে। যা ছিল সারাদিনের ব্যসন, তা এসে আজ দাঁড়ায় শুধু সকালবেলার সাতটা চল্লিশে।

ইতিহাসের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অরুণ দাশগুপ্ত একদিন ফোন করে বলেন 'এর কোনো একটা বিহিত করতে পারেন না আপনারা?'

'কিসের বিহিত?'

'সকালবেলার রবীন্দ্রসংগীত শোনেন না? ওইটুকু শোনাই মানসীর আর আমার দৈনন্দিন সম্বল। কিন্তু তারও মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞাপন? এ নিয়ে তো লেখা উচিত।'

ঠিকই, বিজ্ঞাপনেই তো ভরে আছে সব। দুটো গানের মাঝখানে বা আগেপরে তার প্রয়োগ যে আহত করতে পারে নিবিষ্ট কোনো শ্রোতাকে, সেকথা ভাবতে গেলে আর সংসার চলে কই! তবে আগেপরেই শুধু নয়, বিজ্ঞাপন কখনো কখনো আজ ঢুকে যাচ্ছে গানের গায়েও। ধরা যাক আপনি শুনছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে', আপনারও মন হয়ে উঠছে কোনো 'বাহুপাশের কাঙাল', আর হঠাৎ তখন, সঞ্চারী অংশে পৌঁছে নেমে এল আওয়াজটা, 'গানের টানে পারো না আর রইতে দূরে'র আশ্বাস ভেদ করে উঠে এল জরুরি এই সংবাদ যে অনুষ্ঠানের এ-অংশ শোনা যাচ্ছে কোনো এক কোম্পানির বদান্যতায়। এ কিন্তু কোনো কাল্পনিক উদাহরণ নয়, বাস্তবিক সংঘটন।

না, সাতটা চল্লিশের রবীন্দ্রসংগীতের নয় শুধু। ট্যাক্সিতে পাড়ি দিতে দিতে আরো একটা শোনা যায় অনেকসময়ে— দিনের রাতের যে-কোনো সময়ে— নতুন এক তরঙ্গ, এফএম। গলা খেলাবার পদ্ধতিতে, বিষয়ের নির্বাচনে, শ্রোতাদের সঙ্গে যোগ তৈরি করবার নিত্যনতুন কলাকৌশলে সে-ধ্বনিমালা বুঝিয়ে দেয় : চন্‌মনে এক ঊর্মিল সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেছি আমরা। পৌঁছে গেছি এক ভিন্ন চালে। তারই জন্য নিজেকে নিশ্চয় তৈরি করে নিতে হবে আজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আস্তিত্বিক বেদনা'

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ

প্রশ্ন পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ-কবিতাটি কি স্বপ্নে-পাওয়া কবিতা?

উত্তর অনুমানটা ঠিকই। বেশ কয়েকটি লেখা আমার আছে, যা স্বপ্ন থেকে শুরু, কয়েকটির পুরোটাই স্বপ্ন। যেমন এই একটা।

প্রশ্ন ভিন্ন অর্থে এই কাব্যগ্রন্থে আপনাকে সঞ্জয়ের মতো মনে হয় আমাদের, যিনি নামহারা গহ্বরের দিকে ফিরে ক্রমাগত মৃত্যুচেতনার ধারাভাষ্য দিয়ে চলেছেন।

প্রিয় মানুষদের স্মৃতিঘেরা অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলতে বলতে, তাদের সঙ্গে যাপিত যৌথ দিনগুলির আভাস দিতে দিতে এই কাব্যগ্রন্থের 'আমি' নিছক একজন মুক্ত ভাষ্যকার হয়ে থাকতে পারে না একসময়, সে নিজেও কখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়; একজন সহ-মৃতের ভূমিকায় তার নিজেরও অন্তর্জগতের প্রথম থেকেই ছিল, নাকি দর্শক হিসেবে দেখতে শুরু করে 'আমি' ক্রমশ সংযুক্ত হতে থাকে?

উত্তর : না, এর মধ্যে 'ক্রমশ সংযুক্ত' হবার মতো কোনো ক্রমিকতা নেই। এই একটি বই, যার পাণ্ডুলিপিতে বা মুদ্রণকালে কোনো অদলবদল করতে হয়নি। সেইসঙ্গে একথা বলব যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রশ্নে কবিতায় প্রচ্ছন্ন যে মানসিক জগতের আভাস বলা হলো, তাতে এর লেখক হিসেবে নিজেকে চরিতার্থ মনে হচ্ছে। মনোজগতের কম্পনটা তাহলে অন্তত একজন পাঠকের কাছে ঠিকভাবেই পৌঁছেছে।

প্রশ্ন প্রকাশিত হবার পর গত ৩৫ বছর ধরে এই কবিতাগুচ্ছের আমি এবং তুমি-কে ঘিরে অজস্র অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা সম্ভবত জমা হয়েছে। প্রথমত, 'বসতি ফুরিয়ে যাওয়া জলজ গুল্মের ভারে' শরীর নুয়ে-পড়া যে-'আমার বুকের কাছে নিশ্চিন্ত শকুন ডানা ঝাড়ে', সেই 'আমি' কি মৃত? তবে যে 'এসো ভালোবাসা, এসো, সন্দেহ কোরো না, ভালোবাসো, আমার কপালে আঁকো বেঁচে থাকা, চন্দন, আকাশ', এমন সব অভিলাষ উচ্চারিত হয়!

দ্বিতীয়ত, 'হীনতম অপব্যয়ে ফেলে রেখে গেছ এইখানে' বলে যে-তুমিকে অনুযোগ জানানো চলে, যে-'তোমার মুখের দিকে... নেমে আসে মুখ', কবিতা থেকে কবিতায় সেই তুমিও যেন বদলে যায়। কখনো সদর্থক, কখনো নঞর্থক মনে হয় তাকে; কখনো সে নিছক একজন মানবী, কখনো তার সত্তা মহাজাগতিক।

তোমার আঙুলে আমি ঈশ্বর দেখেছি কাল রাতে
(৫০ নম্বর কবিতা)

তুমি এসে হাত পাতো, হাত রাখো পাথরে ধুলায় / গাছ হয়ে যাবে সব গাছের শিরার মতো হবে (৪৮ নম্বর)

আজও কেন নিয়ে এলে ভ্রষ্ট এই অন্ধ মৃত্যুজপ
(৫২ নম্বর)

তোমার ধ্যানের পুঞ্জ উঠেছিল আকাশের দিকে
(২৫ নম্বর)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কবিতাগুচ্ছ কি স-বিরতি একটি দীর্ঘ কবিতা? এখানে আমি এবং তুমির অবস্থান অবিচ্ছিন্ন কিনা, তাদের অভিমুখ একই দিকে কিনা জেনে নিতে চাই আপনার কাছ থেকে।

উত্তর একাধিক প্রশ্ন বা ভাবনা জড়িয়ে আছে এখানে। শেষের কথাটা দিয়েই শুরু করি। হ্যাঁ, 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'কে আমি একইসঙ্গে একটি দীর্ঘ কবিতা আর চৌষট্টিটি হ্রস্ব কবিতার সমাহার হিসেবে দেখতে পাই, দেখতে চাই। লেখাগুলি যখন শুরু হয়েছিল, তখন টুকরো টুকরো চার লাইনের স্বয়ংসম্পূর্ণ লেখা হিসেবেই আসছিল। কিন্তু পারম্পর্যে গ্রথিত হতে হতে যখন একদিন 'এ আমার আলস্যপুরাণ' কথাটিতে (৬৪ সংখ্যক) পৌঁছলাম, মনে হলো কোনো সমে পৌঁছেছি। আশ্চর্য যে এরপর ওই পর্বে ঠিক এ-রকমভাবে আর আসেনি কোনো লেখা।

কিন্তু এখানে বড়ো প্রশ্নটা হলো আমি-তুমির অবস্থান নিয়ে। এটা ঠিকই যে, সে-অবস্থান এখানে চতুষ্কে চতুষ্কে বদলে গেছে। সেখানে কোনো ধারাবাহিকতায় নয়, প্রতিটি চতুষ্ক তার নিজের দাবিমতো তৈরি করে তুলেছে আমি-তুমির চরিত্র। তুমি-কে এই-যে কোথাও সদর্থক কোথাও নঞর্থক লাগে, কোথাও মহাজাগতিক কোথাও মানবিক, কোথাও মৃত্যু কোথাও জীবন, তা যে আমার এই বইটিতেই কেবল আছে তা নয়, হয়তো আমার সব বইতেই আছে। এমনকী, আমার ধারণা, অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিরই লেখায় এই সঞ্চরণশীলতা আছে। চার দশকেরও বেশি আগে 'কবিতার তুমি' নামে ছোটো একটি লেখায় এ-নিয়ে কিছু কথাও একবার বলেছিলাম।

প্রশ্ন : বিভিন্ন সময় আপনি জানিয়েছেন, 'অসচেতন একটা ধাক্কা না থাকলে' আপনি ছোটো-বড়ো কোনো কবিতাই লিখতেই পারেন না। এই কাব্যগ্রন্থটিকে সামনে রেখে আমার প্রশ্ন, প্রাথমিক এই অসচেতনতা থেকে রচিত কোনো কোনো কবিতা বা তার অংশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কি অন্য আরেকরকম সত্যি হয়ে ওঠে?

উত্তর হ্যাঁ, সে তো হতেই পারে। কবিতার তো এই 'সর্বনাম'ত্ব আছেই। সময়ভেদের সঙ্গে সঙ্গে—এমনকী পাঠকভেদের সঙ্গে সঙ্গে—তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হতেই পারে, হয়েই থাকে।

প্রশ্ন কয়েকটি কবিতায় যেন স্বেচ্ছামৃত্যুর এক দীর্ঘ ছায়া এসে পড়েছে। 'হাজার স্লিপিং পিল মাথার ভিতরে আত্মহারা', এই ধরণের কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি থেকে ১৭, ১৯, ৪০ বা ৫২ নম্বর কবিতায় তেমন একটা আভাস যেন পাওয়া যায়।

উত্তর ৫২ নম্বর কবিতায়, ঠিক স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা না হলেও, একটা মৃত্যুজপের কথা আছে, আছে এমনকী স্লিপিং পিলের কথাও, কিন্তু তাহলেও এ-প্রশ্নে উল্লিখিত ওই টুকরোগুলিতে যা আছে তা মূলত এক অবসাদভার, হৃৎপিণ্ডে অন্ধকারের বোধ, শাপগ্রস্ত দিনের ব্যর্থতার বোধ। সে-বোধ মনে হয় আমার লেখায় আগাগোড়াই ছড়ানো আছে। জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব কাছে যেতে গেলে এ-বোধ তো প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। অন্তত আমার কাছে।

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান আত্মীয়ার মৃত্যুর ছায়া পড়েছে কি ৮, ১১ বা আরো কোনো কোনো কবিতায়? কিছু যদি জানান ওই কবিতা দুটো সম্পর্কে।

উত্তর এটা ঠিক যে, কোনো কোনো নিকটজনের মৃত্যু-অভিঘাত এ-বইয়ের লেখাগুলির পটভূমিতে আছে, খুব প্রত্যক্ষে না হলেও, পরোক্ষে। বিশেষ যে-দুটি কবিতার কথা এখানে উঠে এল, তারও মধ্যে পরোক্ষ তেমন কোনো ছায়া থাকা সম্ভব। যদিও তেমন কোনো সচেতনতায় আমি লিখিনি। কবিতাগুলি লেখা শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। তার ঠিক আগের বছরে আমার কিশোর বয়সের ফেলে-আসা জায়গা পাকশীতে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশ হবার পর সেই প্রথম। গিয়ে শুনেছিলাম রাজাকার আর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার আর হত্যাকাণ্ডের কিছু মর্মান্তিক বিবরণ। আমি খোঁজ নিচ্ছিলাম আমার পুরোনো বন্ধুদের, বিশেষত ঘনিষ্ঠতম এক বন্ধুর। তাকে যাঁরা জানতেন তাঁরা স্তব্ধ রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর জানালেন 'এই যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার নীচেই আছে একটা গণকবর। সেইখানে সেও।' শিউরে-ওঠা সেই মুহূর্তটা ভুলতে পারিনি অনেকদিন। হতে পারে তারও কোনো ছায়া রয়ে গেছে কোথাও। অবশ্য রবিউল ছিল না তার নাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : 'আর্তনাদ করে ওঠে, দুহাত বাড়িয়ে বলে : এসো'; এই আহ্বান কে জানাচ্ছেন? মৃত্যু? (৬ নম্বর)

উত্তর এই কথাটার কোনো উত্তর দেব না, দেওয়া যায় না। একটাই শুধু কথা বলি কোনো বিশেষ একটা প্রতিশব্দ নিয়ে কোনো কবিতাকে ধরতে পারা মুশকিল।

প্রশ্ন : এই কবিতাগুচ্ছ কাব্যগ্রন্থে সাজানোর সময় ক্রম-নির্ধারণ এবং ৬৪টি কবিতার এই যে পরিক্রমা, তার কোরক-ভাবটি নিয়ে আপনি নিজেও কিছু যদি বলেন ভালো হয়।

উত্তর : তাহলে তো নিজের কবিতার নিজেই ব্যাখ্যা করতে হয়। কোরক-ভাব বিষয়ে তেমন-কিছু বলতে পারব না। বা, এই শুধু বলতে পারি যে, পাঠকের কাছে যে-ভাবটি পৌঁছচ্ছে (যদি কিছু পৌঁছয়)—সেটাই তার কোরক। আর অন্য একটা কথা বোধহয় আগেই বলেছি যে, বইতে সাজাবার সময় স্বতন্ত্র কোনো ক্রম-নির্ধারণ করেছি বলে মনে পড়ে না।

প্রশ্ন : 'সবুজ, সবুজ হয়ে শুয়ে ছিল প্রাকৃত পৃথিবী / ভিতরে ছড়িয়ে আছে খুঁড়ে নেওয়া হৃৎপিণ্ডগুলি' (৪১ নম্বর) এই পঙ্‌ক্তি-দুটির অনুষঙ্গে জানতে চাইব, সহজে যা দেখতে পাওয়া যায় না, দেখার অবতলে তেমন চাপ-চাপ অভিজ্ঞতার অজানা কোনো সংশ্লেষ অথবা বিরোধাভাস থেকেই কি কবিতার জন্ম হয়?

উত্তর বেশিরভাগ সময়েই তা-ই হয়। তবে কবিতার জন্ম-বিষয়ে কোনো একক পথ বা পদ্ধতির কথা আমি মানি না। নানা স্তরের কবিতার নানা রকম জন্মমুহূর্ত। যা সহজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পাওয়া যায়, অথচ যার বিষয়ে সবসময়ে আমি তত সচেতন থাকি না, তেমন কোনো দেখার আকস্মিক উদ্‌ভাস থেকেও ভালো কবিতার জন্ম হতে পারে অনেক সময়েই।

প্রশ্ন কোনো কোনো পাঠক কবিতা বুঝতে চান তার অর্থ দিয়ে, অর্থ তেমন পরিষ্কার না হলে তার কাছে সেই কবিতা প্রথমে দুরূহ এবং শেষে পরিত্যক্ত। অনেক পাঠক আবার কবিতাকে ছুঁতে চায় সম্ভবত অর্থ পেরিয়ে-যাওয়া এক সংবেদ দিয়ে; ধরা যাক, এই কাব্যগ্রন্থের ৩৭ নম্বর কবিতাটি গোটা আবহের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এই মুহূর্তে বুঝে ওঠা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। তবু, 'এক মুহূর্তের তাপে কেন্দ্র ও পরিধি কাছাকাছি / যা ছিল যা হবে তার দুই মুখ কথা বলে এসে...', দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই দুটি পঙ্‌ক্তি ঘুরেফিরে হাঁটতে-চলতে ফিরে আসছে আমার কাছে। আমার সঙ্গে কীভাবে যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠছে তাদের। বাইরে থেকে গোটা কবিতাটিকে বুঝতে না-পারার যে নিরুপায়তা তার সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে তাকে দুরূহ বলে পেরিয়ে যেতে না পারাও। কবিতা বুঝতে চাওয়া, কবিতা ভালোবাসার এই দ্বিতীয় পথটির কি কোনোরকম সম্ভাবনা বা মান্যতা আছে?

উত্তর : শুধু যে মান্যতা আছে তা নয়। অনেক সময়ে দ্বিতীয় সেই পথটিরই সবচেয়ে বড়ো সম্ভাবনা বা মান্যতা। কবিতার 'অর্থ' বলতে কী বোঝায় কতদূর বোঝায়, এ নিয়ে দেশে-বিদেশে কথার কোনো অন্ত নেই। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'অর্থ' বা 'অর্থহীনতা' নিয়ে তর্কবিবাদ হয়েছে বিস্তর, অনেক বিশিষ্টজনই সন্দেহ করেছেন সেসব কবিতার কবিত্বে। অস্পষ্টতার অভিযোগে আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলালের মতো লেখকেরা। উলটোদিকে, প্রথম যৌবনে আমরা প্রায়ই আওড়াতাম 'Ars Poetica' নামে আর্চিবল্ড্ ম্যাকলিশের একটি কবিতার শেষ দুটি লাইন। 'A poem should not mean / But be.' সরলার্থের বাইরে চলে-যাওয়া এই প্রবণতার ফলে হয়তো একরকম দুরূহতার সঞ্চার হয় কবিতায়। দুরূহতাই কবিতা নয়, কিন্তু কবিতা অনেক ময়েই গূঢ়ার্থে দুরূহ। এমনও ঘটতে পারে যে, স্বয়ং কবিকে তা ব্যাখ্যা করতে বললে তিনিও হয়তো অপরাগ হবেন। যেমন, এই মুহূর্তে, উদ্ধৃত ওই লাইন দুটির কোনো অর্থ-দায়িত্ব আমিও নিতে পারব না।

AMARBOI.COM

গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ

প্রশ্ন 'কে আমাকে ডাকল, আমি জেগে উঠলাম', এই বিভাব কবিতাটি যেন কবিতার সৃষ্টি-মুহূর্তের উন্মাদনার স্বরলিপি।

সেদিনের কথা, সেই মুহূর্তের কথা আমাদের বলুন না। শিমলায় সেই ভ্রমণের দিনগুলোতে পুরাণ বা ওই ধরনের কোনো প্রাচীন বইপত্র পড়ছিলেন? এই ambience গড়ে উঠল কীভাবে বুঝতে চাইছি।

উত্তর : কবিতার প্রথম ওই লাইনটি ঘটনাক্রমে আক্ষরিক সত্য। গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ লেখা শুরু হয়েছিল কীভাবে, বইটির কয়েক লাইনের 'সূচনাকথা'য় তা বলা আছে। শিমলায় তখন আমি ছিলাম পাহাড়চূড়োয় অপরূপ এক প্রাসাদশীর্ষে, রাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলায় সে-বাড়িতে সম্পূর্ণ একা। তার সঙ্গে মেলানো ছিল দিনরাতজোড়া ঘনমেঘে ঘিরে থাকা—দূরের পাহাড়গুলি থেকে নিজের ঘরের অভ্যন্তর পর্যন্ত। মূল ambience এইটেই।

সে-সময়ে যে বিশেষ কোনো প্রাচীন বইপত্র পড়ছিলাম তা নয়। অবসর ছিল অবশ্য অবাধ আর দায়হীন। তখন পড়ছিলাম ইকবাল। তাঁর 'জাভিদনামা' বইটির ইংরেজি অনুবাদ পড়তে পড়তে এতটাই আচ্ছন্ন লাগছিল যে অনুবাদ করবারও ইচ্ছে জাগে। ফারসি জানা একজন কারো সাহায্য নিয়ে সে-অনুবাদকাজে লিপ্ত হবার কথা ভাবি। অনুক্ষণ ওই বইটার সান্নিধ্য ছাড়া আর কোনো পুরাণপ্রসঙ্গের কথা মনে পড়ে না। তবে ওই বইটির সূত্রে অনেক ইসলামি ইতিহাস বা ভারতীয় পুরাণের আনাগোনা ছিল মনে।

প্রশ্ন ১৯৯৩-তে 'লাইনেই ছিলাম বাবা' প্রকাশিত হবার পরের বছরেই 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশিত হয়। প্রথমটিতে, 'পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ' (ন্যায়-অন্যায় জানিনে) এবং দ্বিতীয়টিতে 'পিঁপড়ের মতন মুখোমুখি / চকিত আদর রেখে চকিতে পিছনে ফেলে যাওয়া / মুহূর্তের স্বাদে গড়া ছোটো ছোটো চিনির বেসাতি—/এসব তো খুব হলো' (২৩ নম্বর)—'ধ্বংসাবশেষের শ্বাস শোনা' সমানে চলতে থাকে এখানেও। তবে এই দুই কাব্যগ্রন্থে কবিতার স্থাপত্যস্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী—প্রথমটি যেন ওপরের তলের আর দ্বিতীয়টি ভিতরে-অতলে। 'লাইনেই ছিলাম বাবা' প্রকাশিত হবার পরের বছরেই 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' কি সচেতন কোনো ভাবনা থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর না, সচেতন কোনো ভাবনা ছিল না এর পিছনে, এ একটা নিরুপায় সংঘটন। বস্তুত প্রকাশ-পারম্পর্যে 'লাইনেই ছিলাম বাবা' অগ্রবর্তী হলেও, দু-একটি লেখা ছাড়া 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ'র লেখাগুলিই অনেক আগেকার, তার সূচনা হয়েছিল ১৯৮৭-৮৮ সালে। আর অন্য বইটির লেখা শুরু ১৯৯১-তে। গান্ধর্বর প্রকাশে অনেকটা দেরি হবার কারণ নিতান্তই একটা প্রকাশক-ঘটিত জটিলতা। একজনকে কথা দিয়েছিলাম বইটি দেব বলে, অন্য একজন বিজ্ঞাপন দিয়ে বসেছিলেন বইটির, দুজনেই আমার স্নেহভাজন কাছের মানুষ। সাময়িকভাবে তাই বই প্রকাশটাই বন্ধ রাখি, এই মাত্র ব্যাপার।

প্রশ্ন : ১৯৮১ সালে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'প্রতিমুহূর্তে সতর্ক না থাকলে নিজের বিষয়ে কতগুলি মূর্খ ধারণা তৈরি হবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়।' এই কাব্যগ্রন্থের ২২ নম্বর কবিতায় দেখতে পাই, 'তুমি দিয়েছিলে গোপনতা / যেটুকু না হলে ফ্লুরোসেন্ট সাজানো বাজারে / নিজেরাই পালকগুলি নিজের শিখরে গুঁজে / সখের মোরগ হয়ে ছিঁড়ে যেতে হতো অপঘাতে...

আপনার নিজের ক্ষেত্রে কবিতায়-বলা জীবনটা বেঁচে থাকার পরিসর কি এইভাবে ছুঁয়ে গেল?

উত্তর সেটা তো হওয়াই সম্ভব। তবে বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, সচেতন কোনো পাঠক কীভাবে অত দূরবর্তী একটা মন্তব্যের সঙ্গে এমন পরবর্তী কোনো কবিতার লাইনকে জড়িয়ে নিয়ে ভাবতে পারেন। এই যোগাযোগটা আমার পক্ষেও কিন্তু একটা আবিষ্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন 'তোমার সমস্ত গানে ডানা ভেঙে পড়ে আছে বক।... প্রতি রাতে মরি তাই, প্রতিদিন আমি হন্তারক।' (৪ নম্বর)

১৯৯৪তে যখন এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়, গানের দেবতা ছিলেন প্রখর সময়ের কাছে পরাজিত, 'ভিখিরির মতো অন্ধ গলিতে রকের পাশে একা'। তার 'উঠে এসো গান গাও বাঁচো' বলবার ক্ষমতাটুকু ছিল না তখন। এই বইমেলায় কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হলে এই পঙ্‌ক্তিগুলো অপরিবর্তিত থাকতো কিনা জানতে ইচ্ছে করে (১০,১২ নম্বর)

উত্তর সময়ের বাইরের চেহারাটাই, খণ্ড চেহারাটাই যে ধরা থাকে কবিতায়, তা তো নয়। তাই কবিতার লাইনকে বছরে বছরে পালটাবার কথা তেমন ওঠে না। গানের দেবতা একই সঙ্গে পরাভবের বেদনা বুকে ধরতে পারেন, আবার হয়ে উঠতে পারেন উজ্জীবক। কিন্তু নিছক খণ্ড সময়ের কথাও যদি হতো, এই সময়টার এমন কী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য? আরো পরাভব? না কিছু উজ্জীবন? কীভাবে, বা কেন পালটাতাম লাইনগুলি?

প্রশ্ন : আমার প্রশ্নে হতাশার দিকটাই উঠে এসেছে। আমার জানবার ইচ্ছে ছিল, সময়ের বাইরের যে ক্ষত এই কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু জায়গায় স্পষ্ট হয়েছে, ওই বইমেলায় প্রথমবারের জন্য বইটি প্রকাশিত হলে তা কি কিছুটা আশাব্যঞ্জক বাঁক নিতে পারত?

উত্তর মনে হয় না তা। এমনকী বাইরের অর্থেও সেই সময়টাকে আমার বাড়তি কিছু আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়নি। কথাটা বোধহয় আরেকটু খুলে বলা দরকার। আগেকার প্রশ্নে যে লাইনগুলির প্রসঙ্গ ছিল, তার অন্তর্গত হতাশার (হতাশা না বলে বিষাদ বলতে আমি পছন্দ করব) কারণ হিসেবে লেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমসাময়িক বিপর্যস্ত বাস্তবতার কথা—রাজনৈতিক সামাজিক নষ্টামির কথা—কারো মনে হতে পারে। এসবের কিছুমাত্র চিহ্ন কবিতাগুলির মধ্যে নেই, তা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু সেইটেই এর মূল স্পর্শ নয়। প্রতিমা-প্রতীক হিসেবে ওগুলি উঠে আসে। গোটা জীবনকে দেখতে দেখতে চলা মানুষের কোনো আস্তিত্বিক বেদনা দিয়ে দেখতে পেলেই কবিতাগুলির কাছে পৌঁছনো যায় বলে আমার মনে হয়। আর সেই দশকুড়ি বছরে এ-মনোভাবের বদল হওয়া শক্ত। কোনো রাজনৈতিক পালাবদলে এ-হতাশার থেকে উত্তরণ সহজে সম্ভব নয়। কখনো কখনো অবশ্য সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় কোনো কোনো কবিতা লিখেছি, কিন্তু 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' ঠিক সেরকম কোনো বই নয়। অন্তত আমি তো সেইরকম ভাবি।

প্রশ্ন যখন 'উড়ন্ত ভস্মের কণা হাতেমুখে মুছে নিতে নিতে / শ্মশানের পাশে বসে অ আ শেখে পাঁচ-ছটি শিশু—/তুচ্ছ করে দিয়ে সব ইহ-চরাচর প্রেতযোনি...', জটলাগা মৃতদেহের মিছিলের মধ্যেও কি তখন একফোঁটা জাদু-বাস্তবতা তৈরি হয়ে যায়? মনে হয়, অন্তত 'দুমুহূর্ত... আজ সমস্ত উড়িয়ে' বেঁচে থাকা যায়? (৩৪ নম্বর, ৩৫ নম্বর)

উত্তর : আমাদের বাস্তব চরাচরই হঠাৎ-হঠাৎ জাদু-বাস্তবতা পেয়ে যায়। উদ্ধৃত কবিতাটিতে যে-ছবিটা আছে, তা একেবারেই প্রত্যক্ষ-করা ছবি, সচল জীবনযাপনের মধ্যে নিজেরই চোখে দেখা। ঠিকই, সেই দেখাটা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন একটা মায়া তৈরি করে, তখনই সমস্ত ক্ষয় উড়িয়ে দিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে, চোখে যদিও এনে দেয় জল।

প্রশ্ন : 'অমৃত পাহাড় থেকে সাগরের তরল গরল' অবধি স্তরে-স্তরে গড়িয়ে-যাওয়া এই কবিতাগুলোতে শূন্যের একটা স্থিরনিশ্চিত ভূমিকা আছে বলে মনে হয়

দুয়ের মধ্যে শূন্য আসে বিশ্বভুবনজোড়া (বিভাব কবিতা)

আর তুমি / শূন্যের ভিতরে ওই বিষণ্ণ প্রতিভাকণা নিয়ে... (১ নম্বর কবিতা)

শূন্য মাটি সপ্ততল এক সূত্রে বেঁধেছে এ-বুকে (২ নম্বর কবিতা)

শূন্য থেকে নেমে এসে কারুকাজে-কাঠের কিনারে (৩ নম্বর কবিতা)

শূন্যের পূর্ণতা নিয়ে ভরে আছে ইবাদতখানা (২৫ নম্বর কবিতা)

তখনই শূন্যের থেকে ঝাঁপ দেয় লক্ষ লক্ষ তারা (৩৬ নম্বর কবিতা)

এখানে 'শূন্য' কি নিরাশা আর অবনমনের ধ্বনি-পুত্র?

উত্তর : 'শূন্য' শব্দটা দুই ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায়, করা হয়। 'কিছুই-না'-এর প্রতিশব্দ শূন্য। কিন্তু সেই একই সঙ্গে 'শূন্য' মানে গোটা Space, তার বিশাল অবাধ বিস্তার। বিশ্বভুবন জুড়ে দিচ্ছে যে শূন্য, সে তো নিরাশা বা অবনমনের অনেক দূরবর্তী অস্তিত্ব। উদ্ধৃত অন্য লাইনগুলিতেও প্রায়শ কি সেটাই নেই? প্রতিটিতেই তো কোনো-না-কোনো ইতিবাচক শব্দের যোগ আছে। প্রতিভাকণা, একসূত্রে বাঁধা, কারুকাজ, লক্ষ লক্ষ তারা, কিংবা 'শূন্যের পূর্ণতা'। এসবেরই মধ্যে জড়ানো একটা বিষাদবোধ অবশ্য থাকতে পারে। বিষাদ আর নৈরাশ্য ঠিক এক জিনিস নয় কিন্তু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কবিতা ৭—'আচম্বিতে জলস্রোতে সমস্ত বৃত্তের অবসান'—এখানে জল যেন মৃত্যুর প্রতিরূপ হয়ে এসেছে। 'শবের উপরে শামিয়ানা' কাব্যগ্রন্থেও 'থাকা', 'ওলটকমল' বা অন্য অনেক কবিতায় বন্যাকবলিত অঞ্চলের অসহায়তা ফুটে ওঠে। 'জলেভাসা খড়কুটো'র বিভাব অংশটুকু প্রথম থেকে সপ্তম গুচ্ছ পর্যায়ক্রমে বন্যা এবং তার পরবর্তী ত্রাণকে ঘিরে বঞ্চিত মানুষের আরো আরো বঞ্চিত হতে থাকার এক কাব্য-দলিল মনে হয়। এছাড়াও এই পঙ্‌ক্তিগুলো দেখতে পাই আমরা—

একাকার মুছে আছে শহরসীমান্ত আর গ্রাম /.../আর এই মিলনের সীমান্তবিহীন দেশকালে /এখনও জ্বরের ঘোরে হাড় কাঁপে, এসো, ভেজা যাক।

এর কোনো শেষ নেই, এ আবাদ, এই জলাজমি / এই রাত দুপ্রহরে ঢল, এই বানভাসি ভোর... ('থাকা', শবের উপরে শামিয়ানা)

জল নেমে যায় বটে, জলের অন্যায় / তখনও নামে না ('জলস্রোত বিভাব অংশ' তুমি তো তেমন গৌরী নও)

তেমনই দূরের জলে দিয়ে আসি মৃত গাভী গলিত শূকর আর তোমাকেও মা ('আরুণি উদ্দালক', তুমি তো তেমন গৌরী নও)

আপনার কবিতায় জলের একটা সংহারমূর্তি বারেবারে দেখতে পাওয়া যায়—এর পিছনে আপনার যেসব ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ভার কাজ করেছে তা কি একটু জানাবেন আমাদের?

উত্তর : কবিতা লিখবার সময়ে কত দিনের কত অভিজ্ঞতা যে মিলেমিশে জড়িয়ে থাকে, তার কোনো হিসেব করা মুশকিল। গোটা জীবনই তার মধ্যে জড়িয়ে যায়। বছর দশেক বয়সে একটা পুকুরে তলিয়ে গিয়েছিলাম অনেকটা, হাঁসফাঁস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছিলাম, জলে ঝাঁপ দিয়ে কোনোরকমে চুলের মুঠি ধরে আমাকে তুলে এনেছিল এক তুতো দিদি। পরে অবশ্য সেই দিদিরই হাত ধরে শিখেছি সাঁতার। ঠাট্টা করে কেউ বলতে পারেন, ওইটেই হয়তো সমস্ত সংহারমূর্তির উৎস। তবে পরিহাসকথা ছেড়ে দিয়ে বলি, উদ্ধৃত লাইনগুলির মধ্যে 'তুমি তো তেমন গৌরী নও'-এর কবিতার কথাও আছে বলে বিশেষ একটা অভিজ্ঞতার বিষয়ে জানাতে হয়। ১৯৬৮ সালের পুজাবকাশের সময়ে জলপাইগুড়ির শহর আর গ্রামাঞ্চলে বিকট একটা প্লাবনে যে ভয়ানক ধ্বংসকাণ্ড ঘটেছিল, জলবন্দী হয়ে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলাম সেই দিনগুলিতে। এটা ঠিক যে 'আরুণি উদ্দালক' আর 'জলস্রোত' কবিতাগুচ্ছে সরাসরি তার দাগ লেগে আছে।

AMARBOI.COM

ছন্দ

প্রশ্ন : 'ঘুম' কবিতাটিকে মুক্তছন্দে ভাবা যায়? 'প্রহর জোড়া ত্রিতাল' কাব্যগ্রন্থে 'অবিশ্বাস' এবং 'প্রান্তিক' বা 'জ্যামে'র পাশাপাশি 'ফেরা' এবং 'ঘুম' লিখছেন—যেন একটা আসা-যাওয়া বা কাছে-দূরের সম্পর্ক চলেছে ছন্দের সঙ্গে।

উত্তর : ঠিকই, 'ঘুম' বা 'ফেরা' মুক্তছন্দেই লেখা, ওই একই বইতে যেমন আরো আছে 'বাবা' কিংবা 'পটভূমি'। খোলা ছন্দ থেকে বাঁধা ছন্দে যাওয়া-আসার প্রবণতা আমার বেশকিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাতেই আছে। কোনো কোনো পাঠকের কানে যে সেটা ধরা পড়ছে, একথা জেনে ভালো লাগে।

প্রশ্ন ছন্দ থেকে অছন্দে সহজে যাতায়াত করা যাবে, এমন এক মুক্তির কথা আপনি বলেছিলেন ছন্দের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে। 'গভীর ঘুমের মধ্যে / হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ সামনে এসে দাঁড়ায়' কি তেমনি এক খোলা-বারান্দা?

উত্তর : হ্যাঁ, তা বলা যায়। তবে, এ-কবিতাটিতে ছন্দ থেকে অছন্দে নয়, যাওয়া আছে অছন্দ থেকে ছন্দে। এসবের মধ্যে একটা আলগা ভঙ্গি এসে যায়।

প্রশ্ন 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' কাব্যগ্রন্থের 'ক্যান্সার হাসপাতাল' কবিতাটিতে প্রতি পরিচ্ছেদ তিনটি করে লাইন নিয়ে তৈরি হয়েছে। আবার প্রতি পরিচ্ছেদের তৃতীয় লাইনটি সামান্য ছোটো হয়ে পরের পরিচ্ছেদের প্রথম লাইন হয়ে ফিরে আসছে—এটি কি কোনো বিশেষ ছন্দ?

উত্তর এখানে বোধহয় 'স্তবক' বা stanza অর্থে 'পরিচ্ছেদ' শব্দটা এসে গেছে? না, এ যে বিশেষ কোনো ছন্দোবন্ধ, বিশেষ কোনো রূপ, তা নয়। আমিও আর কোথাও ব্যবহার করেছি বলে মনে পড়ে না। তবে ঠিক একই রকম না হলেও, লাইন ফিরিয়ে আনবার এই ধাঁচটা আগেকার একটা লেখা 'ভিখিরির আবার পছন্দ'র মধ্যেও আছে। বিশেষ কোনো কারণবশত এ-রকম হয়, তাও বলা যায় না। লেখার চালে আপনি চলে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামসাময়িকতা ইত্যাদি...

প্রশ্ন : আপনি লিখেছেন : রক্তে তো ইংরেজি নেই, বাঁচবে কীভাবে পৃথিবীতে! (রক্তের দোষ / 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার')—কোনো কোনো সাক্ষাৎকারেও আপনি বিদেশী ভাবনার ওপর আমাদের এই নির্ভরশীলতার কথা জানিয়েছেন। আমি জানতে চাইব, আজকের দিনে আমাদের দেশীয় প্রেক্ষিতে ভাবগত এবং শৈলীগত বা যে-কোনো একটি দিক থেকে কাকে সমসাময়িক কবিতা বলব আমরা?

উত্তর কবিতা লিখবার জন্য বিশেষ কোনো দেশীয় প্রেক্ষিত ভাবতে হবে, এটা আমি মনে করি না। সে-প্রেক্ষিত তো আপনিই এসে যাবার কথা তার ভাষাগুণে, তার অভিজ্ঞতাসূত্রে। সমসাময়িক হবার জন্য কোনো স্বতন্ত্র চেষ্টার বা স্বতন্ত্র রূপের দরকার আছে বলে মনে হয় না। যে-কোনো সত্যাশ্রয়ই কবিতাকে সমসাময়িকতা দেয় চিরন্তনের অভিমুখে। 'রক্তে তো ইংরেজি নেই' কথাগুলি বলতে হয়েছিল অন্য একটা কারণে। ভুবনায়নের দাপটে ইংরেজি-সর্বস্বতাকে আমরা শিল্প-সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্যবিন্দু বলে ভাবতে শুরু করেছি আর অনেকসময়ে সেইটেকেই ভাবছি সমসাময়িকতার দাবি, যে-দাবিকে যে-কোনো দেশীয় ভাষা তুচ্ছ বলে গণ্য হতে শুরু করেছে। এই নিয়েই তির্যক ওই লাইনটি এসে গিয়েছিল।

প্রশ্ন অরুণ কোলাৎকারের কবিতা আপনার ভালো লাগে বলে জেনেছি। তাঁর জেজুরি অথবা নৌকোভ্রমণ এবং অন্যান্য কবিতার গঠন এবং ভাবগত নিস্পৃহতা বা নৈর্ব্যক্তিকতা (অথবা একসঙ্গে দুটিই) কি পশ্চিমি আধুনিকতার অবদান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর 'অবদান' শব্দটা হয়তো একটু বেশি ভারী হয়ে যাবে এখানে, যদিও কোলাৎকার নিজেই বলেছিলেন যে, আমেরিকান লোকগানের প্রভাব তাঁর লেখায় আছে। কোলাৎকার ছিলেন দ্বিভাষী কবি, ইংরেজি আর মারাঠি দু-ভাষাতেই লিখতেন সবসময়ে। মজা করে বলতেন, তাঁর একটা দুদিক-কাটা পেনসিল আছে, একদিক দিয়ে লিখলে মারাঠি আর অন্যদিকে ইংরেজি হয়ে যায়। ইংরেজিকে নিজের প্রকাশবাহন করে নিলে পশ্চিমি আধুনিকতার প্রভাব এড়িয়ে চলা শক্ত ঠিকই। তবে সেইসঙ্গে এ-ও মনে রাখতে হবে যে, কোলাৎকার ইংরেজিতে অনুবাদ করতেন নামদেব একনাথ বা তুকারামের —বিশেষত তুকারামের ভক্তিগীতি, যার ভাব আর রূপের সঙ্গে আমেরিকার গণগীতির কিছু মিল খুঁজে পেতেন তিনি। ব্লু-দের সঙ্গে কোলাৎকারের কবিতার ভাবরূপের সাদৃশ্য নিয়ে কথাবার্তাও হয়েছে কিছু—জনজীবনগত ভাবভাষার কথা।

প্রশ্ন আপনার লেখা 'কপিকল' ('শবের উপরে শামিয়ানা') কবিতাটিতে দেখি (উদাহরণ হিসেবে) একটা কার্যকারণে পরম্পরা সবসময় বজায় থাকছে। প্রায় একই সময় ভাস্কর চক্রবর্তীর 'নীল রঙের গ্রহ' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে 'হাতবোমা নয়', 'কে জানলা খুললো', 'মরুপ্রদীপ ১', 'চল্লিশ'—এই সমস্ত কবিতায় পঙ্‌ক্তির মধ্যের জোড়গুলো যেন আলগা হয়ে গেছে মনে হয়।

ভাস্করের এই কার্যকারণ ক্ষয়ে-যাওয়া, আলগা-শুনতে- লাগা ভাষা কি বিদ্রূপ, অসুস্থতাবোধ আর সর্বনাশের আশঙ্কায় মোড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Expressionism কাব্য-আন্দোলনের ভাষা-শৈলীর আদলে গড়ে উঠেছিল? (The poems... are distinguished by an irony which has the dual purpose of satirizing the contemporary civilisation and expressing a malaise, premonition of doom, which was one of the common premises of all the early expressionists. ('A Proliferation of Prophets', M.Hamburger)

ভাস্করের এই ভাষা আগামী দিনে বাংলা কবিতার ভাষা হয়ে উঠতে পারে?

উত্তর : নির্দিষ্ট কোনো আন্দোলনের ভাষা-শৈলীর আদলে ভাস্করের ভাষা গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না, ওর ভাষায় আদল একেবারেই ওর নিজস্ব। একটা সাক্ষাৎকারে ভাস্কর বলেছিল 'এই আকস্মিকতা যে কীভাবে আসে তা আমি নিজেও জানি না।' বা 'যুক্তির থেকে অনেক দূরে সরে থাকি।' এই স্বভাবসিদ্ধতা থেকেই ওর ভাষার উদ্ভব। আগামী দিনের বাংলা কবিতার এইটেই একমাত্র ভাষাভঙ্গি হবে না, কিন্তু অন্যতম তো হবারই কথা।

বস্তুত, আগামী দিনে কেন, এরই মধ্যে কারো কারো হাতে কবিতার এ-ভাষাভঙ্গি চলে এসেছে। কিন্তু এর জন্য Expressionist-দের উৎসমূলে যাবার দরকার করে না, আর ওই 'satirizing' বা 'premonition of doom' ভাস্করের কবিতার ঐকান্তিক লক্ষণও নয়। পরিব্যাপ্ত এক বিষাদবোধের সঙ্গে গাঢ় এক জীবনানন্দও ওর কবিতার স্তরে স্তরে মেলানো, একথা মনে রাখতে হবে। নিজের জীবন বা কবিতা নিয়ে যখনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলেছে ভাস্কর, তখনই এই আনন্দবোধের কথাটা কোনো-না-কোনোভাবে উচ্চারণ করেছে সে। বিদেশের কাব্যান্দোলন বা কবিদের কথা যদি তুলতেই হয়, তবে মনে রাখা ভালো যে, ভাষা আর ভাবের দিক থেকে মনের অনুকূলে জীবনের শেষার্ধে কিছু পোলিশ কবির মানসিক সান্নিধ্যে ও পৌঁছেছিল, বিশেষত তাদেউশ রুজেভিচ, যাঁর কবিতা পড়ে ওর মনে হয়েছিল 'দমবন্ধকরা পৃথিবীর সামনে এক টুকরো শান্তি, স্বস্তি একটু।' নিজের কবিতা-চরিত্রের সঙ্গে এইখানে সেটা মিলে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : 'খোশমেজাজে' কবিতাটিতে ভাস্কর খুব সম্ভবত ওঁর কবিতার ব্যক্তিকাল বা মানবকালের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব-স্থায়িত্বের প্রশ্নভারাতুর আত্মজিজ্ঞাসা থেকে আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন—'বর্তমান কি চিরকালকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে?' (নীল রঙের বই)। ওঁর হয়ে আপনার কাছে এই প্রশ্নটা রাখছি।

উত্তর : ভাস্কর নিজে এটা জিজ্ঞেস করলে (মানে, কবিতার বাইরে, সরাসরি) ওকে হয়তো বলতাম 'তা যদি না করে, তবে স্তব্ধতাই কীভাবে কবিতার ভাষা হয়ে ওঠে? ভাষা বর্তমানের, কিন্তু ইচ্ছে করলে সে ধরে রাখতে পারে চিরকালের স্তব্ধতাকে'। আর ভাস্করের বাইরে, এইখানে বলি : বর্তমানের মধ্যে চিরকালকে ধারণ করবার মুহূর্তটাই যথার্থ সুন্দরের মুহূর্ত। সুন্দরের বোধ। সে-বোধে কখনো কখনো আমার পৌঁছই, পৌঁছতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' কাব্যগ্রন্থে শিশুরাও জেনে গেছে, যন্ত্রের এপার থেকে, ভালোবাসা অর্ধেক স্থপতি, তাই এত শুকনো হয়ে আছো, টল্‌মল্ পাহাড়, সৈকত—এইসব অসাধারণ কবিতা বা তারও অনেক আগে 'বিপুলা পৃথিবী' বা 'মিলন' (নিহিত পাতালছায়া), এই সমস্ত গদ্য-কবিতা অন্য প্রথাগত গড়নের কবিতার মতোই কি পাঠকের সমান প্রিয় হয়ে উঠেছে?

উত্তর : সে-কথা আমি কেমন করে বলব? পাঠকের প্রিয়তা অর্জনের কথা দূরে থাক, পাঠকেরা আদৌ এগুলিকে লক্ষ করেছেন কিনা, তাও-বা জানব কেমন করে? এই প্রশ্নে অন্তত বোঝা গেল ভালো হোক মন্দ হোক, একজন পাঠক এ-কটি কবিতার অস্তিত্ব বিষয়ে জেনেছেন।

প্রশ্ন কোথাও পড়েছিলাম জয় গোস্বামী লিখছেন, হাসপাতাল বা নার্সিং-হোমে থাকবার সময় একজন সেবিকার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তার কাছে আপনার কবিতা শুনে বিহ্বল জয়দা আপনাকে জানান সেই কথা। হয়তো প্রশ্নটা করা এইসব মাথায় রেখেই।

উত্তর হ্যাঁ জয়ের বলা সেই ঘটনার কথাটা আমার বেশ মনে আছে। কেবল সেইটেই নয়, এ-রকম আরো কয়েকটা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, সবারই নিশ্চয় হয়। কেবল একটি-দুটি কবিতা বা কবিতা-বইয়ের প্রতিক্রিয়া অনেক সময়েই পাঠকেরা জানাতে চান, জানান। তেমন অসামান্য কিছু অভিজ্ঞতামুহূর্ত আমার সঞ্চয়ে আছে। তা থেকে কিন্তু বোঝা যায় না যে, যে-কবিতার বিষয়ে আমার কাছে কোনো প্রতিক্রিয়া পৌঁছল না, কোথাও কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি তার। সেইজন্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন লেখার সমান-প্রিয়তার বিচার করা কোনো লেখকের পক্ষে মুশকিল হতে পারে।

প্রশ্ন ফরাসি কবিতায় একসময় খুব চল ছিল টানা গদ্যে লেখা কবিতার; বাঙালি পাঠকের মানসিকতায় এক্ষেত্রে কোথাও কি সহজাত কোনো দূরত্ববোধ কাজ করে?

উত্তর : মনে তো হয় না। তাহলে কি অরুণ মিত্রের কবিতা এত লোকের ভালো লাগত? কেবল অরুণ মিত্র কেন, ও-রকম টানা গদ্যে লেখা কবিতা আরো অনেকের তো আছে। এসব কবিতার তেমন আবৃত্তিধন্যতা হয়তো নেই, কিন্তু যথার্থ কবিতার পক্ষে সেটা খুব বড় কথা নয়।

AMARBOI.COM

অন্যান্য

প্রশ্ন 'বাবুমশাই' (মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়), 'অগস্ত্যযাত্রা', 'চণ্ডীমণ্ডল' (বন্ধুরা মাতি তরজায়), 'লজ্জা', 'ভিখিরির আবার পছন্দ' (মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে), 'অন্ধবিলাপ' (ধুম লেগেছে হৃৎকমলে), 'গানের মতো, শ্যামা' (লাইনেই ছিলাম বাবা) —এই সমস্ত কবিতাতে হয় একটি ছড়ার ছন্দ, নাহলে একটি শ্যামাসংগীত, লোকসংগীত অথবা মহাভারতের কোনো একটি চেনা অংশের আদল চোখে পড়ে।

এটি কি শ্লেষ প্রকাশ করবার প্রয়োজনে, নাকি যারা ততটা কবিতা পড়েন না অথচ প্রতিদিন শোষিত হচ্ছেন, তাদের কাছেও দ্রুত পৌঁছিয়ে দেবার একটা ভাবনা ছিল এর মধ্যে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : দ্রুত বা বিলম্বিত—কোনোভাবেই পাঠকের কাছে পৌঁছবার কথা ভেবে কবিতার রূপ তৈরি হয় না। অন্তত আমার তা হয়নি কখনো। এমনকী, মনোভঙ্গি বা বিষয়ের প্রয়োজনটাও সচেতন কোনো কাজ করে না। কবিতা লেখার সময়ে প্রাথমিক যে ধাক্কাটা আসে, সেটা কোনো ভাবনায় নয়, অনুভবে। আর সেই অনুভব আচমকা একটা লাইন তুলে আনে, কোনো বিশেষ ছন্দে বা ছন্দোহীনতায়। তারপর সেই চালেই চলতে থাকে কবিতাটি। অর্থাৎ রচনাক্রমটা এ-রকম নয় যে, এবার একটু শ্লেষ করা যাক কিংবা অনেক পাঠকের বা বিশেষ ধরণের পাঠকদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা যাক, আর সেইজন্য এবার ছড়ার ছন্দ ধরা যাক কিংবা লোকসংগীত বা পৌরাণিক আখ্যান।

যে-কবিতাগুলির কথা বলা হলো এখানে, তার মধ্যে 'ভিখিরির আবার পছন্দ' কিন্তু ছ-মাত্রার চালে লেখা, ছড়ার ছন্দে নয়। 'থাক সে পুরোনো কাসুন্দি / যুক্তিতর্ক চুলোয় যাক / যেতে বলছ তো যাচ্ছি চলে / ভাঙবার শুধু সময় চাই।' এভাবে এগোতে এগোতে 'ভিখিরির আবার পছন্দ' লাইনটা পড়ার টানে কথ্য চালে স্বভাবতই হয়ে যায় 'ভিখিরিরাবার পছন্দ'। এইভাবে এখানে প্রতিটি লাইনেই প্রথম পর্বটি ছ-মাত্রার, শেষটি অপূর্ণ, চার কিংবা পাঁচ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন ভাবগত বা শৈলীগত কোনোরকম পূর্ব-ভাবনাই থাকছে না তাহলে? তবে কি একে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত রচনা বা automatic writing বলতে পারি?

উত্তর না, এ বোধহয় ঠিক automatic writing-এর কথা নয়। সেখানে থাকে সম্পূর্ণ অবচেতনার উৎসার। সেখানে প্রায়ই আচ্ছন্ন দশায় লেখার একটা ব্যাপার থাকে। অনেক সময়ে LSD জাতীয় মাদকসেবনে চেতনাকে দূরে সরাবার একটা ব্যবস্থাও থাকে। গিন্‌স্‌বার্গেরা যেমন করতেন। আগে-পরে এ-রকম আরো অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। আমি যেটার কথা বলছিলাম তা হলো, প্রাক্-পরিকল্পনাহীন আকস্মিকতায় কোনো লাইন এসে যাওয়া। এই এসে যাওয়াটার পিছনে মনের ভিতরে অনেকদিনের ভাবভাবনার, অনেকদিনের অভিজ্ঞতার মিশেল থাকতে পারে। কিন্তু সেটা সেই মুহূর্তের বিশেষ কোনো ভাবনা থেকে হয়তো আসছে না সচেতনভাবে। ব্যক্তিগত একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা বলতে পারি। বহুকাল আগে একদিন চৌরঙ্গি অঞ্চলের একটা বাড়িতে এক আমন্ত্রণসভায় যাচ্ছি, তার উলটো ফুটপাথে পৌঁছে গেছি, ফুটপাথ থেকে পা নামাতে গিয়েই আবার তুলে নিতে হলো, কেননা যান-চলাচল শুরু হয়ে গেছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অকারণেই একটা লাইন মাথায় এল 'হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়'। বুঝতে পারলাম আরো কিছু কথা আসবার সম্ভাবনা এখন। সভায় না গিয়ে এলোমেলো হাঁটতে শুরু করলাম রাস্তায়, কিছুক্ষণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল 'সঙ্গিনী' নামে বারো লাইনের একটা কবিতা, পূর্বপরিকল্পনাহীন। ভাবনাসূত্র যে কোথাও থাকে না তা নয়, থাকে না কেবল প্রাক্-পরিকল্পনা। অন্তত আমার ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' কাব্যগ্রন্থটির 'মেয়েদির পাড়ায় পাড়ায়' বা 'আশি বছরের মুখে' কবিতা-দুটির মতো বেশ কিছু কবিতায় ঘটনার সঙ্গে আত্মীয়তা চোখে পড়ার মতো—তেমন যে-কোনো একটি কবিতা সামনে রেখে ঘটনা থেকে কবিতায় যাবার মধ্যে কেমন সব গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আপনাকে, জানতে চাইব।

উত্তর এই গ্রহণ-বর্জনের সুনির্দিষ্ট কোনো ধরণ আছে বলে তো মনে হয় না। যে-দুটি কবিতার কথা উঠল এখানে, সে-দুটির পিছনে প্রত্যক্ষ কোনো ঘটনা আছে তা ঠিক। কিন্তু দু-রকমের প্রত্যক্ষ সেটা। 'আশি বয়ছরের মুখে'র মধ্যে নদীবিশারদ আর APDR সংগঠনের একসময়কার প্রধান কপিল ভট্টাচার্যের ছবি আছে। তাঁর ছেলে প্রদ্যুম্ন আমার দীর্ঘকালের বন্ধু, আর সেই সুবাদে আমি ওঁর স্নেহভাজন। উদ্ধৃতিচিহ্নিত সংলাপটি প্রায় আক্ষরিক বসানো আছে কবিতায়। 'প্রায়' বলছি এইজন্য যে বলেছিলেন তিনি আরো কিছু শব্দ, তার কিছুটা বর্জিত হয়ে স্মৃতিতে ধরা বাকি অংশটা এসেছে এখানে। মধ্যবর্তী আমার প্রশ্নগুলিকে ছেড়ে দিয়ে, আর কথাক্রমকে হয়তো একটু ভেঙে দিয়ে। সংলাপ অংশের পরবর্তী চারটি লাইনই কিন্তু কবিতাটাকে টেনে এনেছিল, কেননা ঘর ছেড়ে পথে বেরোনোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর রাস্তার ধারে বসা শীতের সবজিওয়ালাদের পণ্যসম্ভারের উজ্জ্বলতা দেখে মনে পড়ে গিয়েছিল ওঁর মুখের উজ্জ্বল আশ্বাসের কথা, শারীরিক শীর্ণতা সত্ত্বেও আত্মপ্রত্যয়বান উজ্জ্বল হাসির কথা। পথেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল লেখাটি।

আর 'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়' লেখা হয়েছিল কাগজের এক-লাইন খবর পড়ে। কবিতাটির শিরোনামের পরে অংশত সেটি উল্লেখ করাও আছে। গ্রামীণ একটি যুবতী বধূ তার আট মাস বয়সের মেয়েটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেও ডুব দিয়ে মরে, এই ছিল খবর। অদেখা সেই বধূটির কথা মনে পড়তে থাকে শুধু, তার সঙ্গে মিলে যেতে থাকে দেখা-না-দেখা আরো অনেক নির্যাতিতার ছবি, তাদের কেউ-বা আত্মহত্যা করেছে, কেউ-বা জীবনের মধ্যেই নিহত। তারপর কবিতার শব্দগুলি আসতে থাকে তার নিজের চালে।

প্রশ্ন 'শবের উপরে শামিয়ানা' কাব্যগ্রন্থে 'জলেভাসা খড়কুটো' বিভাব অংশে প্রথমগুচ্ছের 'তুমি' এবং দ্বিতীয়গুচ্ছের 'তুমি' একই অস্তিত্ব? প্রথম গুচ্ছের 'তুমি', 'গান গাইবার সময়ে... সুরের কালো হাওয়া' আবার দ্বিতীয়গুচ্ছের, 'তুমি এলে / শূন্য থেকে শূন্যে ঝরে রুপোলি প্রপাত।' প্রথম গুচ্ছে 'তুমি'-কি সভ্যতা? ৪৭ নম্বর কবিতায় 'তুমি' কি নিয়তি বা ভবিষ্যৎ ('আমার সর্বনাশের পাশে তোমাকে বসিয়েছি...')?

উত্তর : বিশেষ কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে কবিতাকে—বা তার অন্তর্গত কোনো প্রতিমা-প্রতীককে সুচিহ্নিত করার বিপদ আছে। কবিতাটা আটকে যায় তাতে। ও-রকমভাবে হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়া যায়, যদি পুরোপুরি একটা allegory-র ব্যবহার হয় লেখায়। না, এখানে তেমন কোনো allegory নেই। শুধু প্রথম গুচ্ছ দ্বিতীয় গুচ্ছ নয়, 'জলেভাসা খড়কুটো'র সবকটা গুচ্ছেই 'তুমি'র একটা সমতা আছে মোটের ওপর, নিজে একে আমি প্রেমের কবিতা হিসেবেই জানি। তবে, সেই প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশকাল ইতিহাস ভূগোল, তাই সেখানে নানারকমের হৃদয়ভাবের ওঠাপড়া যাওয়া-আসা আছে। কোনো সরলরেখায় বা একক শব্দে তাকে পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন 'শবের উপরে শামিয়ানা' কাব্যগ্রন্থে 'জলেভাসা খড়কুটো' বিভাব অংশের ৪৫-নম্বর কবিতাটিতে কি অবিভক্ত বাংলাদেশের কোনো ইঙ্গিত থাকছে? '—কতদিন, কতদিন আর মানুষ এ-রকম থাকতে পারে—! আঃহা, বলতে তো ভুলেই গেছি পঞ্চাশ বছর আগে আমরা কী ভেবেছিলাম!'

উত্তর ইঙ্গিতটা বিভক্ত বাংলাদেশেরই। তবে সেই সূচনাসময়টার কথা—যখন আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম যে এই বিভাজন স্থায়ী হবে না, হতে পারে না, অচিরেই দূর হবে বিভেদ। কিন্তু এই কথাগুলির ঠিক আগেই আছে ঘোর বর্তমানের কথা, 'জলেরও কোনো ভাগবাটোয়ারা নেই'-ধরনের আকস্মিক উচ্চারণ। বস্তুত, পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' হয়ে উঠবার পরে আমাদের অনেকের কাছেই হয়তো মিলন-বিচ্ছেদ-পুনর্মিলন একাকার হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন 'একদিন ছিল, আজ সে-জলের তল থেকে দেখি / মাটির উপরে সেই স্থলপদ্ম পরিত্যক্ত বাড়ি' ('স্থলপদ্ম', 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার')—এ কি আপনার ছোটোবেলার স্মৃতিজড়িত বসতবাড়ি?

উত্তর : একেবারেই তাই। দেশ ছাড়বার ঠিক পঞ্চাশ বছর পর সেই বাড়ির কাছে একবার যেতে পেরেছিলাম। ফিরে আসার পর বেশ কয়েকটা লেখাতেই ঘুরে ঘুরে এসেছে সেই বাড়ির ভিতর-বাহিরের পরিব্যাপ্ত ছায়া।

প্রশ্ন এর আগে আমরা পেয়েছি, '...সেই / স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা, / তোমায় আমি বুকের ভিতর নিইনি কেন রাত্রিবেলা?' ('অলস জল', 'নিহিত পাতালছায়া')—সেটা কি দেশভাগের সময় ছেড়ে আসা বাংলাদেশের স্মৃতি?

উত্তর কবিতাটির প্রথমাংশে যে ছবিগুলি আছে তার পুরোটাই ছেড়ে আসা দেশের, তারপর সেটা স্মৃতি হয়ে জড়াতে চায় যে-শহরে সে তো আমার ছিন্নমূল অবস্থান। আর, একেবারে শেষ লাইনটায় সেসব ছাড়িয়ে এটা চলে যেতে হয় অপূর্ণতার সংশয়ে আতুর এক প্রেমানুভবে।

প্রশ্ন আপনার অনেক কবিতায় আত্মঘাত, বিশ্বাসভঙ্গ, বন্ধুকে হারানোর মতো বিষয়গুলো লেখার নীচে বয়ে যেতে যেতে একটা অন্তরঙ্গ ব্যথার ভার তুলে আনে

* ছাড়া পেয়ে চলে যায় বন্ধুবিচ্ছেদের মতো সটান রেখায় (১৭ নম্বর কবিতা 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ')

*...তুমি কি শুনেছ? / তোমার আলোর কোনো ব্যূহমুখ নেই। কীভাবে বা / খুলে নিয়ে আসি তার এমন একাকী ঘের থেকে... কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* আমি সেই স্তবে ভরা নীরব পলের পাশাপাশি / কিছুই-না এর প্রেমে অবলীন ধীর হয়ে আছি।

* তারও পর যতটুকু বাকি থাকে তারই নাম চুপ / তোমার আমার মধ্যে সেই নীল অতিকায় কূপ। (যথাক্রমে 'ব্যূহমুখ', 'অবলীন', 'অতিকায় কূপ'—'শবের উপর শামিয়ানা'।)

উত্তর ধারাবাহিক বন্ধুবিচ্ছেদই তো জীবনের অন্য নাম। সে-বন্ধুর অবশ্য নানা রূপ, নানা পরিচয়।

শেষ করবার আগে একটা কথা বলি। অনেকেই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নানা সময়। কিন্তু এত বেশি নিবিড় ভাবে কবিতাকেন্দ্রিক প্রশ্ন খুব বেশি লোকের কাছে পাইনি আগে।

AMARBOI.COM

'কালি ও কলম' পত্রিকার পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন দীপকরঞ্জন ভট্টাচার্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~